উগ্র জাতীয়তাবাদ, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদের বিপদ প্রসঙ্গে
— **প্রভাস ঘোষ**

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৬ জুন, ২০১৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৭

প্রকাশক ঃ মানিক মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১০ টাকা

উগ্র জাতীয়তাবাদ, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদের বিপদ প্রসঙ্গে

প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

প্রকাশকের কথা

আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে ২৪ এপ্রিল, ২০১৭ অন্যান্য বহু রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্য কমিটির আহ্বানে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রধান বক্তা সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পূর্ণ ভাষণ 'গণদাবী'র ৬৯ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা (৫ - ১১ জুন, ২০১৫) ও ইংরেজি অনুবাদ 'প্রলেটারিয়ান এরা' ৫০ বর্ষ ২০ সংখ্যায় (১ জুন, ২০১৭) প্রকাশিত হয়েছে। ওই ভাষণ বর্তমানে পুস্তক আকারে প্রকাশের সময় কমরেড প্রভাস ঘোষ নিজে কিছু বিষয় যুক্ত করেছেন।

২৬ জুন, ২০১৭ **মানিক মুখার্জী**

উগ্র জাতীয়তাবাদ, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদের বিপদ প্রসঙ্গে

কমরেড প্রেসিডেন্ট, কমরেডস ও বন্ধুগণ,

প্রতি বছরই ২৪ এপ্রিল আমাদের দল এস ইউ সি আই(কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আমরা উদযাপন করি। এই দিনটিতে আমরা এ যুগের মহান চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই(কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করি।

এদেশের এবং গোটা বিশ্বের জনগণ আজ এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন। আজ সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ বিশ্ব জুড়ে উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ-বর্ণবিদ্বেষ-জাতিবিদ্বেষ-ধর্মবিদ্বেষ-সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি দিয়ে চলেছে, ফ্যাসিবাদকে শক্তিশালী করছে। যদিও এটা কোনও আকস্মিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

দেশে দেশে পুঁজিবাদ চরম সংকটে জর্জরিত

আজ সমগ্র বিশ্বের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত। এমনকী সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরে আজ গোটা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য সত্ত্বেও দেশে দেশে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা তীব্র বাজার সংকটে জর্জরিত। এর মানে হচ্ছে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশ তলানিতে পৌঁছেছে। পুঁজিবাদী দুনিয়ার হিসাবেই বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অর্থাৎ ৩০০ কোটির বেশি মানুষ যে সব পরিবারে বাস করে তাদের পারিবারিক গড় দৈনিক আয় হল ১৬১ টাকা। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ১ শতাংশের সম্পদের পরিমাণ বাকি ৯৯ শতাংশ মানুষের সম্পত্তির সমান। বিশ্বের জনগণের মোট সম্পদের অর্ধেকের মালিক হচ্ছে ৮৭ জন ধনী ব্যক্তি। এই প্রায় নিঃস্ব জনগণই হচ্ছে পুঁজিবাদী বাজারের ক্রেতা। আপনারা জানেন, অতীতে এক সাম্রাজ্যবাদী দেশ কর্তৃক অন্য

সাম্রাজ্যবাদী দেশের লুণ্ঠনের বাজার দখলের জন্যই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধেছিল। পরবর্তীকালে বাজার নিয়ে এ রকম তীব্র সংকটকে ভিত্তি করে এসেছিল 'প্রোটেকশনিজম'। প্রত্যেক রাষ্ট্র তার নিজের জাতীয় বাজার রক্ষা করবে, অন্য দেশের পণ্য-পুঁজি ঢুকতে বাধা দেবে, কিন্তু অপরের বাজারে ঢুকবে। এই নিয়ে পরবর্তী সময়ে চলল 'ট্রেড ওয়ার', 'ইকনমিক ওয়ার'। ৯০-এর দশকে বিশ্বপুঁজিবাদ 'গ্লোবালাইজেশন'-এর স্কিম নিয়ে এল। বলল মুক্ত বাণিজ্য চালু করো, সমস্ত দেশের বাজার উন্মুক্ত করে দাও। এই গ্লোবালাইজেশন-এর নাম করে অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো, যারা একদা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাহায্য নিয়ে খানিকটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল, তাদের বাজার গ্রাস করতে থাকল। এখন গ্লোবালাইজেশনের ফানুস ফেটে গেছে। সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে চূড়ান্ত মন্দা। যদিও তারা এখন রিসেশন বা মন্দা শব্দটা ব্যবহার করে না, তার পরিবর্তে বলে স্লোডাউন অফ ইকনমি। কখনও বলে বাবল ইকনমি। অর্থাৎ বুদবুদের মতো ফাঁপা ফোলানো অর্থনীতি। আবার ডাউন সাইজিং অফ ইন্ডাস্ট্রি কখনও কখনও সামান্য চাঙ্গা হলে বলে 'অ্যানিমিক রিকভারি', 'জবলেস রিকভারি', এইসব নতুন নতুন শব্দ আসছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই দেখুন আজ লক্ষ লক্ষ বেকার, হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাই চলছে। আমেরিকায় এবার প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের অবস্থা দেখুন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ডোনাল্ড ট্রাম্পরা উগ্র জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, উগ্র ধর্মবিদ্বেষ জাগাতে আওয়াজ তুলল— 'আমেরিকা ফর আমেরিকানস', 'আমেরিকা ফর হোয়াইট আমেরিকানস', অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের জন্য আমেরিকা। স্লোগান তুলছে বিদেশি হঠাও, ল্যাটিন আমেরিকানদের তাড়াও, নিগ্রোদের তাড়াও। একটা বিরাট নিগ্রো পপুলেশন আছে আমেরিকায়, তাদের বিরুদ্ধে বর্ণগত ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে। অথচ এই দেশেই শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন একদিন দাস নিগ্রোদের মুক্ত করার জন্য শ্বেতাঙ্গ মালিকদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। আর সেই দেশের আজকের দশা দেখুন। নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই ডোনাল্ড ট্রাম্প কয়েকটি মুসলিম দেশকে চিহ্নিত করল যেসব দেশের নাগরিকদের আমেরিকায় ঢুকতে দেবে না। ভারতবর্ষের যারা আমেরিকায় মূলত ভারতীয় মালিকানাধীন আই টি সেক্টরে চাকরি করতে যায়, তাদের আটকাবার জন্য 'এইচ ওয়ান বি ভিসা'র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এল। কারণ কী? আমেরিকান যুবকরা আজ বেকার, চাকরি জুটছে না। তাদের কাজ দিতে হবে, তাই আমেরিকান ছাড়া সকলকে হটাও। কিছুদিন আগে আমেরিকাতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়েছিল, 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট।' সাত মাস ধরে আমেরিকান যুবকরা বিক্ষোভ জানাল। তারা স্লোগান তুলল— 'ডাউন উইথ

ক্যাপিটালিজম', 'ডাউন উইথ গ্লোবালাইজেশন', 'উই আর নাইন্টিনাইন পার্সেন্ট, দে আর ওয়ান পার্সেন্ট'। এই ছিল অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট। এর সামনে কোনও নেতা বা আদর্শ ছিল না। আমেরিকার শোষিত নির্যাতিত ক্ষুধার্ত মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেই— ইংল্যান্ড, ইটালি, জার্মানি, ফ্রান্স এবং জাপানে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড শ্রমিক বিক্ষোভের ঝড় উঠছে, প্রায়ই ধর্মঘটের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। এই বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে জনগণের ঐক্য ভাঙার জন্য মূল শত্রু সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদকে আড়াল করে জনগণের এক অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে ভ্রাতৃঘাতী বিরোধে প্ররোচিত করার জন্য বিপ্লবভীত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসকরা আজ বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ, জাতি বিদ্বেষের আগুন জ্বালাচ্ছে। এটা হচ্ছে সংগ্রামভীত ও সম্ভাব্য বিপ্লবের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের গভীর ষড়যন্ত্র। কারণ তারা জানে, অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট, শ্রমিক ধর্মঘটের জোয়ার বারবার আসবে এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করবে। তাই তারা গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে নানা রূপে ফ্যাসিবাদকে মজবুত করছে। এই ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ১৯৪৮ সালেই মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, (ক) অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ পুঁজির একচেটিয়াকরণ, খ) রাষ্ট্রের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত করা এবং প্রশাসনে চূড়ান্ত ক্ষতিকারক আমলাতান্ত্রিক কঠোরতা গ) সংস্কৃতির যন্ত্রীকরণ (কালচারাল রেজিমেন্টেশন) যা অধ্যাত্মবাদ ও কারিগরি বিজ্ঞানের অদ্ভুত সংমিশ্রণে গড়ে তোলা হয়। (সময়ের আহ্বান, শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি, ২য় খণ্ড) । তিনি আরও বলেছেন, "মনে রাখবেন, একটা জাতি খেতে না পেলেও উঠে দাঁড়ায়, না খেতে পেলেও সে লড়ে, যদি মনুষ্যত্ব থাকে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠলে মানুষ বলতে দেশে আর বিশেষ কেউ থাকবে না। কারণ মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সে বাধা সৃষ্টি করে। ...অর্থাৎ দেশে একদল শিক্ষিত কারিগর সৃষ্টি করে, যারা মানবিক মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত, মানুষের প্রতি এবং সমাজের প্রতি যাদের কোনও দায়িত্ববোধ নেই, যারা চাকরিকে ও গোলামিকেই সর্বস্ব বলে মনে করে , পয়সার বিনিময়ে তারা যা কিছু করতে পারে। এইভাবে বিজ্ঞানের চর্চা ও বিদ্যাকে তারা প্রবাহিত করে। অপরদিকে মানুষের মধ্যে যত অধ্যাত্মবাদ, সেকেলে যত কুংসংস্কার, যত যুক্তিহীন মানসিকতা এবং অন্ধতাকে গড়ে তোলে। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ, তমসাচ্ছন্ন ভাবনাধারণার এবং যুক্তিহীনতার সাথে কারিগরি বিদ্যার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ" (ফ্যাসিবাদ ও বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নৈতিকতার সংকট, শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড।) তিনি বলেছিলেন, উন্নত

কি অনুন্নত বিভিন্ন দেশে নানা রূপে ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠছে।

আজ বিশ্বব্যাপী সব দেশেই এই ফ্যাসিবাদ গড়ে তোলা হচ্ছে। পশ্চিমের যে দেশগুলিতে সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশ শতকে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রতিবাদ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গণআন্দোলন করার অধিকার, 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা' 'বাই দি পিপল, অফ দি পিপল, ফর দি পিপল'— এই সব বাণী সেদিনের বুর্জোয়ারা নবজাগরণের অধ্যায়ে ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে অধ্যাত্মবাদ ও রাজতন্ত্রবিরোধী লড়াইয়ের সময়ে ধ্বনিত করেছিল, আজকের দিনের বুর্জোয়ারা সেই প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এতটাই প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে যে, তারা সেই ঘোষণাগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পদদলিত করে মানবজাতির চরম শত্রু ফ্যাসিবাদ কায়েম করছে। ভারতবর্ষেও কংগ্রেস শাসনের যুগ থেকে তাই ঘটছে। যদিও কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি মাল্টিন্যাশনাল গড়ে তুলে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করলেও ভারতে ক্ষুদ্র পুঁজি ও আঞ্চলিক পুঁজির ব্যাপক অস্তিত্ব ও ভূমিকা আজও আছে যা জার্মানির মতো সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্তরায়। তা ছাড়া এদেশে বহু লিবারেল ডেমোক্র্যাট, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মানুষ আছেন, যাঁরা ফ্যাসিবাদ বিরোধী।

৩৬৮ পিয়নের পদের জন্য ২৩ লক্ষের আবেদন

ভারতবর্ষের পরিস্থিতি দেখুন। কংগ্রেসের 'গরিবি হঠাও'-এর মতো বিজেপি-র 'আচ্ছে দিন', 'কালোটাকা উদ্ধার করে প্রত্যেক ভারতবাসীকে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া', 'বছরে ২ কোটি নতুন চাকরি দেওয়া', 'দুর্নীতি দূর করা', সি পিএমের 'গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা', তৃণমূলের 'দুর্নীতি দূরীকরণ ও উন্নয়ন' ইত্যাদি সব প্রতিশ্রুতিই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। চার বছর আগে ভারতের রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, ১২১ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষ, তার মধ্যে ৬৬ কোটি হচ্ছে বেকার, অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি বেকার। এখন সংখ্যাটা বেড়ে ৭০-৭৫ কোটিতে দাঁড়াবে। বেকার ও অর্ধবেকার ধরলে ৮০-৯০ কোটিতে দাঁড়াবে বেকারের সংখ্যা। এই হচ্ছে এ দেশের চেহারা। গত বছরের রিপোর্ট— উত্তরপ্রদেশে ৩৬৮টি পিয়নের পোস্টে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করেছে ২৩ লক্ষ মানুষ। এর মধ্যে ডক্টরেট, এম এ, এম এস সি, বি এ, বি এস সি— এ রকম সব ডিগ্রিধারী আছে। পশ্চিমবাংলায় ৬ হাজার গ্রুপ-ডি পোস্টের জন্য ২৫ লক্ষ আবেদন করেছে। এখানেও ডক্টরেট আছে, ইঞ্জিনিয়ার আছে, এম এ, এম এস সি আছে। যেখানে ক্লাস এইট পাশ হলেই চলে। এই হচ্ছে শিক্ষিত বেকারদের

অবস্থা। অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা আর কর্মচ্যুত শ্রমিকের সংখ্যা ধরলে আরও কয়েক গুণ বাড়বে। হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। গ্রামের মানুষের কাজ নেই। চাষের অবস্থাও সংকটজনক। খরা, বন্যায় চাষিজীবন বিপর্যস্ত। গত কয়েক বছরে সাড়ে তিন লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। এই হল আমাদের দেশের উন্নয়নের চিত্র!

এ দেশে শিশু এবং নারী বাজারের পণ্য। ক্ষুধার্ত মানুষ, অভাবগ্রস্ত পরিবার চোখের জল ফেলতে ফেলতে শিশুকে বিক্রি করে সামান্য টাকার বিনিময়ে। এই শিশুরা কোথায় যায়? এরা হয় বন্ডেড লেবার, অর্থাৎ দাসশ্রমিক, মালিক বদ্ধ প্রাচীর দিয়ে আটকে রেখে উদয়াস্ত খাটায়। এই শিশুদের কাজের কোনও ঘণ্টা বাঁধা নেই, শুধু খাবার দেয় আর কাজ করায়। এই দাস শ্রমিক বিদেশেও আছে। ভারতবর্ষে ১ কোটি ২০ লক্ষ দাস শ্রমিক, এদের মধ্যে শিশুরাও আছে। আর নারীদেহ হয়েছে বাজারে সস্তার পণ্য। কতভাবে বাজারে এই পণ্য বিক্রি হয়! বিয়ের নামে ছলনা করে, অভাবী অসহায় অভিভাবককে ১০/২০ হাজার টাকা দিয়ে দু-চারদিন রেখে তারপর বেশি টাকায় বাজারে বিক্রি করে দেয়। প্রত্যেক রাজ্যেই এই রকম নোংরা ব্যবসা চলছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গেও নারীদেহ বিক্রির আরেকটা বিরাট বাজার তৈরি হয়েছে। হাজার হাজার অভাবী সংসারের মেয়েরা অন্ধকার হলে রাস্তায়, বাজারে, স্টেশনে দাঁড়ায় নিজেদের বিক্রি করে সংসার চালাতে। এই হল এ রাজ্যের উন্নয়নের চিত্র!

ফলে গোটা দেশ আজ একটা চরম অবর্ণনীয় দুর্দশায় এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে দেশে শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত কোটি কোটি যুবক বেকারত্বের জ্বালায় ছটফট করছে, ছাঁটাই-লে অফ-ক্লোজারে কর্মচ্যুত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজের জন্য হাহাকার করছে, পাশাপাশি বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম, ট্যাক্স, বাসভাড়া, ট্রেনভাড়া, পণ্য মাশুল, রান্নার গ্যাসের দাম, ওষুধের দাম, শিক্ষার ব্যয়ভার। এই রকম একটা দুঃসহ অবস্থার মধ্যে মানুষের বিক্ষোভও বাড়ছে। মাঝে মাঝে বিক্ষোভ ফেটেও পড়ছে এখানে সেখানে। এই অসংগঠিত বিক্ষোভ যাতে সম্মিলিত আন্দোলনের রূপ না নিতে পারে, তার জন্য ধর্মীয় বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগানো হচ্ছে, অন্ধতা ও উগ্রতা সৃষ্টি করা হচ্ছে, আরও নানা অবাস্তব, মনগড়া, অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক চিন্তা-ভাবনা আমদানি করে দেশকে ফ্যাসিবাদের অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া পুঁজিবাদের বাঁচার উপায় নেই, এটাই আজকে পুঁজিবাদের শেষ আশ্রয়। আর একটা বিষয় বলতে চাই। আজকের দিনে বিশ্ব পুঁজিবাদ অন্তিম শয্যায়, পচা-গলা-দূষিত দেহের মতো। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক সবদিক থেকেই অধঃপতিত, দূষিত।

ফলে বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা, যারাই পুঁজিবাদের হয়ে রাষ্ট্র বা সরকার চালাচ্ছে, তারাও অধঃপতিত, ভণ্ড, দুর্নীতিগ্রস্ত, কেউ কেউ 'ডিবচ'ও। আমাদের দেশের সকল সরকারি দলের মধ্যেই এই নোংরা চরিত্র দেখতে পাবেন। ভোটের আগে যত তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুঙ্কার দেয়, সরকারে বসে তারাই তত বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়।

ধর্ম বিশ্বাস আর ধর্মীয় বিদ্বেষ এক নয়

একটা কথা এখানে বলা দরকার। ধর্ম বিশ্বাস আর ধর্মীয় বিদ্বেষ এক নয়। আমরা মার্কসবাদী, আমরা নিরীশ্বরবাদী। ইতিহাসে বড় বড় ধর্ম প্রচারক যাঁরা এসেছেন, আমরা তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা করি। তবু মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে একটা অপপ্রচার চলে আসছে যে তারা ধর্মপ্রচারকদের অশ্রদ্ধা করে। এটা ঠিক নয়। বরং, বুর্জোয়ারা যখন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, সেই সময় বুর্জোয়া চিন্তানায়করা, যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা, সেক্যুলার হিউম্যানিস্টরা— বেকন, স্পিনোজা, হবস, লক, কান্ট, ফুয়েরবাখরা ধর্মপ্রচারকদের অশ্রদ্ধা করেছিলেন, ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করেছিলেন এবং ধর্মকে অ্যাবারেশন অফ হিস্ট্রি বলে গণ্য করেছিলেন। তাঁদের কাছে এটা যেন ইতিহাসের একটা বিচ্যুতি, বিপথগামিতা, ফলে তা পরিত্যাজ্য। মহান মার্কসই প্রথম দেখান— মানব ইতিহাসে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কী গভীর শ্রদ্ধায় মার্কস বলেছিলেন, "ধর্মীয় দুঃখ একই সাথে প্রকৃত দুঃখেরই প্রকাশ। ধর্মীয় প্রতিবাদ অত্যাচারিত মানুষের প্রতিবাদ। ধর্ম হচ্ছে অত্যাচারিত মানুষের দীর্ঘশ্বাস ও হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়, বিবেকহীন অবস্থার বিবেক" (মার্কস এঙ্গেলস— ধর্ম প্রসঙ্গে)। মার্কস বললেন, অত্যাচারিত দাসদের চোখের জল এবং দীর্ঘশ্বাস থেকে এসেছে ধর্মীয় চিন্তা। ধর্ম এনেছে হৃদয়হীন, বিবেকহীন পৃথিবীতে হৃদয় এবং বিবেক। মার্কসের সুযোগ্য সহযোদ্ধা মহান এঙ্গেলস বলেছিলেন, "খ্রিস্টান ধর্ম শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য স্বর্গ কামনা করে। আর পৃথিবীতেই বৈজ্ঞানিক পথে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে সেই স্বর্গই প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা লড়ছি।" কমরেড শিবদাস ঘোষ খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের দাসপ্রথাবিরোধী সংগ্রাম উল্লেখ করে বলেছেন, "দাসপ্রভুদের অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কখনও কখনও ধর্মকে লড়াইয়ের পক্ষে কাজে লাগানো হয়েছে। ... ক্রিশ্চিয়ান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের ক্ষেত্রে দাসপ্রভুদের বিরুদ্ধে দাসদের লড়াইয়ে ধর্মকে এইভাবে কাজে লাগাবার নজির পাওয়া যায়" (মার্কসবাদ ও মানব সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে, শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি, ২য় খণ্ড)। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, দাস প্রথার বিরুদ্ধে ধর্ম সংগ্রাম করেছিল। এই অর্থে সমাজে

একদা ধর্মের প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। দাসপ্রথার অবসান ঘটিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজতন্ত্র এসেছিল— এটাও সত্য। ধর্মীয় চিন্তার সাথে আমাদের পার্থক্য দর্শনগত ও এসব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। কোনও ধর্মবিশ্বাসকে আমরা আঘাত করি না, বাধাও দিই না। বরং যাঁরা সৎভাবে ধর্ম মানেন, সমাজে অন্যায়, অধর্ম বা পাপ কাজের বিরুদ্ধতা করেন, তাঁরা বহুদূর পর্যন্ত আমাদের সংগ্রামের সাথী হবেন। কিন্তু ধর্মকে নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেন, মানুষকে প্রতারণা করেন, তাঁদের সাথেই আমাদের বিরোধ।

ভারতে ধর্মীয় সুরই চিরন্তন নয়

আবার আপনাদের জানা দরকার, ধর্মীয় চিন্তা মানবসমাজে প্রথম থেকেই ছিল— এই ধারণা ভ্রান্ত। ইতিহাসে এর কোনও নজির নেই। আজও আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে যেসব আদিম জনগোষ্ঠী বাস করে, বা আন্দামানে যে জারোয়া, আন্দামানি বা যে সব ট্রাইবস বাস করে তারা ঈশ্বর বলে কিছু জানে না, ভগবানের পূজা করে না। তারা কিন্তু মানুষ। আদিম সমাজে স্থায়ী সম্পত্তি, সম্পত্তির মালিকানা, ধনী-গরিব, শাসক-শাসিত এ সব আসেনি। তখন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ বাঁচার জন্য প্রকৃতির সাথে লড়াই করত, নানা প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করার জন্য, প্রকৃতিকে জয় করার জন্য, প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করার জন্য, নানা প্রাচীন ম্যাজিকের আশ্রয় নিত, নানা মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করত, কিন্তু কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ঈশ্বরের চিন্তা তখন ছিল না। তাদের চিন্তা ছিল বস্তুজগতভিত্তিক। স্বয়ং বিবেকানন্দ বলেছেন, "প্রথম দিকে মানুষ বাইরে প্রকৃতির মধ্যেই বিশ্বের সত্য খুঁজেছিল। এটা ছিল বস্তুময় জগৎ থেকেই জীবনের সমস্যার সমাধান পাওয়ার চেষ্টা" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় খণ্ড)। তিনি বড় মানুষ ছিলেন। তিনি এ কথা বলেননি যে, মানুষ প্রথম থেকেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। আমাদের দেশে প্রাচীন যুগে বুদ্ধ, যাকে ভগবান বুদ্ধ বলা হয়, তিনি ভগবানে বিশ্বাস করতেন না। জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরও ভগবানে বিশ্বাস করতেন না। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ— এই পঞ্চভূত অর্থাৎ পাঁচটি বস্তু থেকেই এই বিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টি, এই ধারণা একদিন এ দেশে প্রচলিত ছিল। কেউ কেউ ব্যোম বা আকাশ বাদ দিয়ে চতুর্ভূত বা চারটি বস্তু দিয়ে সবকিছু তৈরি হয়েছে বিশ্বাস করতেন। বস্তুকণা দিয়ে সবকিছু সৃষ্টি এ কথা কণাদ মুনিও বলেছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রের শূন্যের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারও এ দেশেই হয়েছিল। দর্শন কথাটার অর্থই হচ্ছে, যাহা দেখি তাহা সত্য। এই চিন্তার এ দেশেই জন্ম। এ দেশেই আজও ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শন পড়ানো হয়।

লোকায়ত দর্শন, চার্বাক দর্শন ইত্যাদি পড়ানো হয়। ফলে একথা ঠিক নয় যে, ভারতীয় সমাজের চিরন্তন সুর হল ধর্মীয়।

মানবসমাজে ধর্মবিশ্বাস কীভাবে জন্ম নিল

কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ধর্মবিশ্বাস এসেছিল দাসপ্রথার যুগে। সেই যুগে যাঁরা চিন্তাশীল ছিলেন, অত্যাচারিত দাসদের কান্নায় ব্যথিত হয়ে সমাধানের পথ খুঁজছিলেন। তাঁরা দেখলেন, সমাজ যেমন দাসপ্রভু চালাচ্ছে, দাসপ্রভুর শাসনই নিয়ম, তেমনই দিবারাত্রির ও নানা ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে, প্রাণের জন্ম-মৃত্যু হচ্ছে— সবকিছুই একটা নিয়মে চলছে। তাহলে নিশ্চয়ই এই বিশ্বেরও একজন প্রভু আছে। ফলে, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, দাসপ্রভু-দাস তাঁরই সন্তান। এই শোষিত দাসদের কল্যাণের জন্য তাঁরা বিশ্বপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। সেই সময় কল্যাণকর যেসব চিন্তা তাঁদের সৎ মনে এসেছিল, তাঁরা ধরে নিলেন এসব বিশ্বপ্রভু বা ঈশ্বরের প্রেরিত বাণী। পরম বিশ্বাস নিয়ে বিশ্ববিধাতার বাণী বা ধর্ম হিসাবে এসব চিন্তা তাঁরা প্রচার করলেন। সেই সময়ে অত্যাচারী দাসপ্রভুরা ধর্মপ্রচারকদের উপর চরম অত্যাচার করছে, হত্যা করেছে, অনেকে অনাহারে মারা গেছেন। এঁদের এই সংগ্রাম আজও আমাদের প্রেরণা দেয়। এই শিক্ষাই কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের দিয়েছেন।

আবার এই ধর্মকে হাতিয়ার করেই রাজতন্ত্রে ধর্মভিত্তিক শাসন এসেছে, মধ্যযুগীয় শোষণ-অত্যাচার চলেছে। তাই প্রজাতন্ত্র বা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠার জন্য সেই যুগের পুঁজিপতিরাই ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছিল। আর যে সকল দার্শনিক ও চিন্তানায়করা সেই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁরাও বড় মানুষ ছিলেন। আমাদের দেশে যারা বলে, ঈশ্বর না মানলে চরিত্র থাকে না, তাদের বলতে হবে— বিদ্যাসাগরের চরিত্র ছিল না, শরৎচন্দ্রের চরিত্র ছিল না, শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং-এর চরিত্র ছিল না। ভগৎ সিং ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে 'কেন আমি নাস্তিক' বই লিখে গিয়েছেন। এঁরা কি উন্নত চরিত্রের ছিলেন? কেন বিদ্যাসাগরকে রামকৃষ্ণ শ্রদ্ধা করেছিলেন, বিবেকানন্দ শ্রদ্ধা করেছিলেন? ফলে এই কথাটি ঠিক নয়।

কে যথার্থ হিন্দু — বিবেকানন্দ না আরএসএস-বিজেপি নেতারা

বিজেপি-আর এস এস এখন স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে গীতা-বেদ-বৈদিক গণিত-সংস্কৃত ভাষা ইত্যাদি পড়াতে চায়। অথচ আপনারা জানেন, আমাদের দেশে নবজাগরণের সূচনালগ্নে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের বিরুদ্ধে

প্রথম জ্ঞানের আলো নিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর বক্তব্য কী? রাজা রামমোহন রায় বলছেন, "সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতি দেশকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। এই দেশে ইতিমধ্যেই দু'হাজার বছর ধরে এই শিক্ষা চলে আসছে। ব্রিটিশ সরকার হিন্দু পণ্ডিতদের দিয়ে পুনরায় তাই চালু করছে। যার ফলে মিথ্যা-অহংকার জন্মাবে। অন্তঃসারশূন্য চিন্তা, যেটা স্পেকুলেটিভ মানুষেরা করেছেন, সেটাই বাড়বে। বেদান্ত শিক্ষার দ্বারা যুবকরা উন্নত নাগরিক হতে পারবে না। বেদান্ত যেটা শেখায় সেটা হচ্ছে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। উন্নততর ও উদার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অঙ্ক শাস্ত্র, প্রাকৃতিক দর্শন, কেমিস্ট্রি, অ্যানাটমি ও অন্যান্য কার্যকরী বিজ্ঞান শিক্ষা" (লেটার টু লর্ড আমহার্স্ট— রামমোহন রায় রচনাবলি)। এ সব কে বলছেন? বলছেন রাজা রামমোহন রায়। ফলে তিনি সংস্কৃত ও বেদান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাহলে আর এস এস-বিজেপির শিক্ষাচিন্তা হচ্ছে রামমোহন রায়ের শিক্ষাচিন্তার বিরুদ্ধে।

রামমোহন রায়ের পথ ধরে দেশে এলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বলছেন, "কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত-সাংখ্য-অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ আমাদের পড়াতেই হচ্ছে। কিন্তু সাংখ্য-বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, তা আর বিবাদের বিষয় নয়" (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ)। বিদ্যাসাগর বলছেন, 'সাংখ্য-বেদান্ত হচ্ছে ভ্রান্ত দর্শন'। তিনি এগুলি পড়াতে চাইছেন না, কিন্তু বাধ্য হয়ে পড়াতে হচ্ছে। লক্ষ করুন, এই বিদ্যাসাগরকেই শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। এই বিদ্যাসাগরকেই শ্রদ্ধা করতেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ নিজে বলছেন, পূর্ব ভারতে আমার মতো এমন কোনও যুবক নেই, যে বিদ্যাসাগরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি। বিবেকানন্দ জানতেন, বিদ্যাসাগর বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলেছেন। বিবেকানন্দ জানতেন, বিদ্যাসাগর নিরীশ্বরবাদী ছিলেন এবং বলেছেন, বেদান্ত ভ্রান্ত, সাংখ্য ভ্রান্ত, ধর্মীয় চিন্তা ভ্রান্ত। তিনি বলছেন, "ফলে ইউরোপ থেকে এমন দর্শন পড়ানো উচিত, যে দর্শন পড়লে আমাদের দেশের যুবকরা বুঝবে যে বেদান্ত এবং সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন" (বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ)। তিনি আরও বলছেন, "ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি আরব খলিফার গোঁড়ামির চেয়েও কম নয়। তাঁদের বিশ্বাস, যে ঋষিদের মস্তিকের থেকে শাস্ত্রগুলো বেরিয়েছে— তাঁরা সর্বজ্ঞ। অতএব তাঁদের রচিত শাস্ত্র অভ্রান্ত।" বিদ্যাসাগর এভাবে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে বলছেন। বলছেন, "আমাদের দেশে এমন শিক্ষক চাই— যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন, ইংরেজি জানেন। আর চাই ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত শিক্ষক" (করুণাসাগর বিদ্যাসাগর — ইন্দ্র মিত্র)। কে বলছেন? বলছেন

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর নিজে চারটি বই লিখেছিলেন। কোনও বইতেই ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও আলোচনা নেই। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। বলছেন, "পড়াতে হবে ভূগোল, জ্যামিতি, সাহিত্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক দর্শন, মডার্ন ফিলোজফি, সায়েন্স, পলিটিক্যাল ইকনমি" (করুণা সাগর বিদ্যাসাগর— ইন্দ্র মিত্র)। এই হচ্ছে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গি, যাঁর পদতলে এদেশের সকল বড় মানুষই মাথা নত করেছিলেন। দেখুন, এই দুই মনীষী ধর্মীয় শিক্ষার বিরোধিতা করে প্রাকৃতিক দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপরই জোর দিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রের আরেকজন মনীষী জ্যোতিরাও ফুলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। কংগ্রেস শাসকরা উল্টোটাই করেছে। বিজেপি-আর এস এস সেই উল্টো পথে আরও জোর দিয়েছে। বিজেপি- আর এস এস নেতারা আস্ফালন করে প্রচার করছেন, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সি ভি রমন, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা এবং ইউরোপের অন্যান্য নামকরা বৈজ্ঞানিকেরা কিছুই নতুন আবিষ্কার করেননি। সবই নাকি প্রাচীন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ছিল। এমনকী প্রধানমন্ত্রী এমনও দাবি করেছেন, গণেশের মূর্তিই প্রমাণ করে ভারতে প্ল্যাস্টিক সার্জারির প্রচলন ছিল। ভারতে প্রাচীনকালে যে বিজ্ঞান চর্চা ছিল না, তা নয়। কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দুঃখ করে বলেছেন যে, প্রাচীন ভারতেও গ্রিসের মতো বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়েছিল। কিন্তু বেদান্তের মায়াবাদ বস্তুজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করায়, তার প্রভাবে এ দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেমে গিয়েছিল। এ কথাও আপনাদের জানাতে চাই, স্বয়ং বিবেকানন্দ ধর্ম ও বিজ্ঞানের নিরন্তর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখে বলেছিলেন, "ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ কী, তাহা আমরা জানি; আর ইহাও জানি যে, উহা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববাদীগণের কীরূপ ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে। যেমন যেমন এক-একটি নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে, অমনি যেন তাঁহাদের গৃহে একটি করিয়া বোমা পড়িতেছে, আর সেইজন্যই তাঁহারা সকল যুগেই এই সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় খণ্ড)। তিনি আরও বলেছেন যে, 'চাই ওয়েস্টার্ন সায়েন্সের সাথে বেদান্ত'। এই বিবেকানন্দ সম্পর্কে বিজেপি-আর এস এস নেতারা কী বলবেন?

এবার দেখুন, রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়েও বলছেন, "ধর্মের মোহ মানুষকে নির্জীব করে রাখে। তার বুদ্ধিকে নিরর্থক জড় অভ্যাসের নাগপাশে অস্থিতে-মজ্জাতে নির্দিষ্ট করে ফেলে। বুদ্ধি যেখানে শৃঙ্খলিত, পুরুষকার যেখানে গুরুভারগ্রস্ত, সে হতভাগ্য দেশে সর্বপ্রকার দৈহিক, মানসিক, রাজনৈতিক অমঙ্গল অব্যাখ্যাত, অচল হয়ে যায়।" এই হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্র বলছেন, "কোনও ধর্মগ্রন্থই অভ্রান্ত হতে পারে না। বেদও ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং এতেও মিথ্যার অভাব নেই" (চরিত্রহীন)। "... সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এত বড় শত্রু আর নেই" (পথের দাবী)। "... কোনও দেশের বৈশিষ্ট্যের জন্য মানুষ নয়। মানুষের জন্যই তার আদর। আসল কথা বর্তমান কালে সেই বৈশিষ্ট্য মানুষের পক্ষে কল্যাণকর কি না। এ ছাড়া সমস্ত শুধু অন্ধ মোহ। মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়। আর তাই যখন ভুলি, বিশেষত্বও যায়, মানুষকেও হারাই" (শেষ প্রশ্ন)। এই বলেছেন শরৎচন্দ্র। এঁরাই হচ্ছেন সেই যুগের নবজাগরণের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। একইভাবে শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং যুবকদের ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করার জন্য 'কেন আমি নাস্তিক' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার আগে এক বৃদ্ধ কয়েদি পরামর্শ দিয়ে বলেছিল, তুমি তো এতদিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করনি, ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে অন্তত গীতা পাঠ কর। ভগৎ সিং হাসিমুখে উত্তর দিলেন, আমার গীতা হচ্ছে মহান লেনিনের পুস্তক, তা আমি পাঠ করেছি।

আমি এঁদের কথাগুলো শোনাচ্ছি এই জন্য যে, আজকে বিজেপি যা বলছে, যা করতে যাচ্ছে, তা রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ফুলে-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-সুভাষচন্দ্র-ভগৎ সিংরা যা শিখিয়ে গেছেন সম্পূর্ণ তার বিরোধী। আমরা কাকে মানব? মার্কসবাদও যদি আপনারা না মানতে চান, আমাদের দলকেও যদি না মানতে চান, পশ্চিমবাংলার জনগণ, ভারতবর্ষের জনগণকে ভাবতে হবে, এই সব বড় মানুষদের অস্বীকার করে আবার সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের দিকে কি আমরা চলে যাব? বেদ-বাক্য অভ্রান্ত, মনুসংহিতার বিধানই শেষ কথা— এই ভাবনার যুগে চলে যাব? কংগ্রেস মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ে কাজে সেটাই করেছে, এখন বিজেপি-আর এস এস জোর কদমে সেই পথেই চলছে, উদ্দেশ্য দেশের মানুষের মধ্যে ফ্যাসিবাদী গোঁড়া যুক্তিহীন মনন গড়ে তোলা।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলতে চাই। এ দেশে দাবি করা হয় এবং বহুল প্রচারিত ধারণা হয়ে আছে, এমনকী অন্য বামপন্থী দলগুলিও মনে করে, ভারতীয় রাষ্ট্র সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু এটা ঠিক নয়। যথার্থ সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কাকে বলে, এই সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি মূল্যবান বক্তব্য আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। তিনি বলছেন, "একটি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে এবং রাজনীতি, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত রেখে ধর্মকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় গণ্য করে, ... একটি ধর্মনিরপেক্ষ

রাষ্ট্রে যারা ধর্মে বিশ্বাসী ও যারা ধর্মে বিশ্বাসী নয়, উভয়েই সমান অধিকার ও সুযোগসুবিধা ভোগ করে। কারও ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ না করা বা আঘাত না করা এক জিনিস, আর কারও ধর্মীয় মানসিকতায় উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়ে সুড়সুড়ি দেওয়া সম্পূর্ণ আর এক জিনিস। ... ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যদি সকল ধর্মে সমান উৎসাহ দান বোঝায় তা হলে বাস্তবিক পক্ষে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে পার্থক্য এই জায়গায় এসে দাঁড়ায় যে, প্রথমটি যদি ইসলামিক ধর্মীয় রাষ্ট্র হয়, তা হলে দ্বিতীয়টি একটি বহু ধর্মীয় রাষ্ট্র" (শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি , শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি, ৪র্থ খণ্ড)।

কে যথার্থ দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী — বিজেপি-আরএসএস, না স্বদেশি আন্দোলনের নেতারা

আপনারা অনেকেই হয়ত জানেন না, আর এস এসের এক নেতা, গোলওয়ালকর তাঁর নাম, আর এস এস তাঁকে গুরু বলে মানে, তিনি লিখছেন, "হিন্দুস্থানের সমস্ত অ-হিন্দু মানুষ হিন্দু ভাষা এবং সংস্কৃতি গ্রহণ করবে। হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধা করবে ও পবিত্র বলে জ্ঞান করবে। হিন্দু জাতির গৌরবগাথা ভিন্ন অন্য কোনও ধারণাকে প্রশ্রয় দেবে না। ... না হলে সম্পূর্ণভাবে এই দেশে হিন্দু জাতির অধীনস্থ হয়ে, কোনও দাবি ছাড়া, কোনও সুবিধা ছাড়া, কোনও রকম পক্ষপাতমূলক ব্যবহার ছাড়া, এমনকী নাগরিকত্বের অধিকার ছাড়া তাদের এ দেশে থাকতে হবে" (উই অর আওয়ার নেশনহুড — গোলওয়ালকর)। অর্থাৎ যাঁরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী নন, তাঁদের হয় হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু ভাষা মানে সংস্কৃত ভাষা, একে মান্য করতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে। আর এ যদি তাঁরা না করেন, তা হলে এ দেশে কোনও অধিকার তাঁদের থাকবে না। এই হচ্ছে আর এস এসের গুরু গোলওয়ালকরের হুকুমনামা। এ দেশের বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, দেশবন্ধু, নেতাজি, গান্ধীজি থেকে শুরু করে কোনও স্বদেশি নেতাই এ রকম বলা তো দূরের কথা, ঘুণাক্ষরেও কি ভেবেছিলেন? শুধু তাই নয়, গোলওয়ালকর এমনকী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' আখ্যা দিয়ে বলেছিলেন, "The theories of territorial nationalism and common danger, which formed the basis for concept of nation, had deprived us of the positive and inspiring content of our real Hindu Nationhood and many of the 'freedom movements' virtually anti-British movements. Anti-Britishism was equated with patriotism and nationalism. This reactionary view has had disastrous effects upon the entire course of the freedom struggle,

its leaders and the common people." (Bunch of Thoughts— M S Golwalkar)। একবার ভেবে দেখুন কী ভয়ঙ্কর বক্তব্য! অর্থাৎ আর এস এস গুরুর বক্তব্য অনুযায়ী, যেহেতু স্বাধীনতা আন্দোলন অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে মূল শত্রু গণ্য করে পরিচালিত হয়েছিল, তার ফলে এই স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতবাসীকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের সদর্থক ও প্রেরণাদায়ক চিন্তা থেকে বঞ্চিত করেছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনকে নিছক ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে পরিণত করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সমার্থক করেছিল। এই প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি করেছে, নেতাদের ও জনগণের ক্ষতি করেছে। আর এস এস প্রধানের এই বক্তব্য অনুযায়ী সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলনটাই প্রতিক্রিয়াশীল ছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ ছিল না, যেহেতু এটা হিন্দু জাতীয়তাভিত্তিক ছিল না। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী নেতাজি, দেশবন্ধু, তিলক, লালা লাজপত, গান্ধীজি থেকে শুরু করে শহিদ ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, সূর্য সেন প্রমুখেরা দেশপ্রেমিক ও যথার্থ স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না। এই বক্তব্য বলার পরেও কি বিজেপি এবং আর এস এস নিজেদের 'জাতীয়তাবাদী' ও 'দেশপ্রেমিক' বলে দাবি করতে পারে? সেই অধিকার তাদের আছে? আর এজন্যই এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আর এস এসের কোনও ভূমিকা ছিল না। এর পরও কোনও সৎ দেশপ্রেমিক বিজেপি-আর এস এসের ঝান্ডা বহন করতে পারেন! যে আর এস এসের বিচারে সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন 'প্রতিক্রিয়াশীল' ছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা-কর্মী ও শহিদেরা 'দেশপ্রেমিক' ছিলেন না, সেই আরএসএস-বিজেপির পায়ের তলায় আজ কি ভারতবর্ষের যৌবন, পশ্চিমবাংলার যৌবন মাথা নিচু করবে? টাকার লোভে আর 'হিন্দুত্বের' স্লোগানে বিভ্রান্ত হয়ে এই দেশের যুবকরা নিজেদের বিবেক বিক্রি করবে? এটা বিস্ময়কর নয় যে ফ্যাসিস্ট হিটলার যখন রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, বার্নার্ড শ, রমাঁ রলাঁ সহ বিশ্বের জনগণ দ্বারা নিন্দিত, তখন গোলওয়ালকরজি হিটলারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখলেন, "জার্মানির জাতীয় গৌরববোধ আজকের দিনের আলোচ্য বিষয় হয়েছে। নিজস্ব জাতির ও সংস্কৃতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য সেমেটিক রেইস ইহুদিদের বিতাড়ন করে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। জাতীয় গর্ববোধ এখানে সবচেয়ে প্রতিভাত হয়েছে। জার্মানি দেখিয়ে দিয়েছে যে কেন বিভিন্ন ধরনের জাতি ও সংস্কৃতিকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, যার থেকে আমরা হিন্দুস্থানীরা শিখতে ও লাভবান হতে পারি" (উই অর আওয়ার নেশনহুড—গোলওয়ালকর)। এ তো ফ্যাসিস্ট হিটলারের প্রতিধ্বনি!

কে যথার্থ হিন্দু? চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ নাকি আর এস এস, বিজেপি নেতারা?

আমি এবার বিবেকানন্দ কী বলছেন আপনাদের তা পড়ে শোনাচ্ছি। বিবেকানন্দ বলছেন, "খ্রিস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না, মুসলমানকে হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রিস্টান হতে হবে না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করে পুষ্টি লাভ করবে এবং নিজের বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী গড়ে উঠবে। ... আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানেই নিয়ে যেতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেল নাই, কোরানও নাই, অথচ সে কাজ করতে হবে বেদ-বাইবেল ও কোরানকে সমন্বয় করেই। ... আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় খণ্ড)। তিনি বলছেন, "রামায়ণের কথাই ধরুন— অলঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে উহাকে মানিতে হইলেই যে, রামের ন্যায় কেহ কখনও যথার্থ ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। রামায়ণ বা মহাভারতের মধ্যে যে-ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে, তাহা রাম বা কৃষ্ণের অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না; হিন্দু ধর্ম কোনও ব্যক্তি বিশেষের উপর একেবারে নির্ভর করে না। কোন পুরাণে বর্ণিত দার্শনিক সত্য কত দূর প্রামাণ্য, তাহার বিচার করিতে হইলে ঐ পুরাণে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই ছিলেন অথবা তাঁহারা কাল্পনিক চরিত্রমাত্র— এ বিচারের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই" (স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন, উদ্বোধন কার্যালয়, ৯ম খণ্ড)। বিবেকানন্দের এই উক্তি থেকে পরিষ্কার, রাম ও কৃষ্ণের প্রকৃতই অস্তিত্ব ছিল, তিনি নিজে তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলেছেন, এইসব চরিত্র বাস্তবিক হতে পারে বা কাল্পনিক হতে পারে। ফলে এরা বাস্তবে ছিলেন কি না, এই বিতর্ক বাদ দিয়ে হিন্দুদের রামায়ণ-মহাভারত থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন। এরপর, রামের জন্মস্থান খোঁজা ও রামমন্দির তৈরির স্লোগান চলে কি? এসব কথা বলেছেন বিবেকানন্দ। তা হলে বিবেকানন্দ হিন্দু, না আর এস এস-বিজেপি নেতারা হিন্দু? বিবেকানন্দ বলছেন, "আমার যদি একটি সন্তান থাকত, তাকে মনঃসংযমের অভ্যাস এবং সেইসঙ্গে এক পঙক্তি প্রার্থনার মন্ত্রপাঠ ছাড়া আর কোনও প্রকার ধর্মের কথা আমি শিক্ষা দিতাম না। তারপর সে বড় হয়ে নানা মত এবং উপদেশ শুনতে শুনতে এমন কিছু একটা পাবে, যা তার কাছে সত্য বলে মনে হবে। তখন সেই সত্যের যিনি উপদেষ্টা, সে তাঁরই শিষ্য হবে। সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খ্রিস্টান এবং

আমি নিজে মুসলমান হতে পারি" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় খণ্ড)। এবার বিচার করুন বিবেকানন্দ হিন্দু, না বিজেপি-আর এস এস নেতারা হিন্দু? ওরা বলে এ দেশে ইসলাম ধর্মের বিস্তার মুসলমান রাজারা, সম্রাটরা অস্ত্রের জোরে করেছে। আর এর বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ বলছেন, "ভারতের মুসলিম বিজয় নির্যাতিত গরিব মানুষকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল। সেই জন্য এ দেশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মানুষ মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। এসব শুধু অস্ত্রের জোরে হয়নি, অস্ত্রের জোরে আর ধ্বংস করে এ কাজ হয়েছিল এমন চিন্তা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা জমিদারদের, পুরোহিতদের কবল থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল" (স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলি (ইং), ৮ম খণ্ড)। অর্থাৎ বলছেন, হিন্দু জমিদার এবং পুরোহিতদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গরিব নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা মুসলমান হয়েছিল। কে বলছেন? বলছেন, স্বয়ং বিবেকানন্দ। তা হলে কে ঠিক? আর এস এস না বিবেকানন্দ? এদের কোনও নৈতিক অধিকার আছে বিবেকানন্দের ছবি বহন করার?

বিজেপি নেতারা বাবরি মসজিদ ভাঙল, যেটা একটা ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ, যেমন আফগানিস্তানের তালিবানরা বুদ্ধের মূর্তি ভেঙেছিল। বাবরি মসজিদে কেউ নমাজও পড়ত না, জঙ্গলের মধ্যেই ছিল। স্রেফ ভোটের জন্য পৌরাণিক কাল্পনিক চরিত্র রামচন্দ্রের নামে সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে মসজিদ ভাঙল। আমরা প্রশ্ন করতে চাই, আগেও যে প্রশ্ন করেছিলাম, সেটা হচ্ছে চৈতন্য কি হিন্দু ছিলেন? রামকৃষ্ণ কি হিন্দু ছিলেন? বিবেকানন্দ কি হিন্দু ছিলেন? তাঁরা কি জানতেন না বাবরি মসজিদ কোথায় এবং কী তার ইতিহাস? তাঁরা তো হিন্দুদের বলেননি যে, এই মসজিদ ভেঙে রামমন্দির কর। তাঁরা কি কাপুরুষ ছিলেন? একটা মিথ্যা রটিয়ে, স্রেফ ভোটের দিকে তাকিয়ে এতবড় একটা ঐতিহাসিক সৌধকে তারা ভাঙল এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাল। মন্দির প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলছেন, "যদি ভালো চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নরনারায়ণের—-মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজো করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ, তার পূজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম। ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম 'কর্ম' নয়, ওর নাম পাগলা-গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৭ম খন্ড)। বিবেকানন্দ

বলছেন, আসল যে গরিব মানুষ, তাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আর তোমরা কত মন্দির করছ, সোনার অলঙ্কার পরাচ্ছ। এ সবকে বিবেকানন্দ ধিক্কার দিচ্ছেন। বিবেকানন্দ বলছেন, "রুটি চাই — রুটি চাই! আমি এমন ভগবানে বিশ্বাস করি না যে আমায় ইহজগতে রুটি দিতে পারে না, কিন্তু স্বর্গে সে আমায় নিত্য মঙ্গল ও চিরন্তন পরম স্বর্গসুখ প্রদান করবে। ফুঃ! যদি ভারতকে তুলতে হয় তাহলে গরিবের জন্য আরও খাদ্য চাই, তাদের জন্য শিক্ষা বিস্তার করতে হবে আর পুরোহিততন্ত্রের দুষ্ট, ক্ষতিকর ও অশুভ প্রভাব দূর করতে হবে। পুরোহিততন্ত্র আর নয়। কোনও সামাজিক অত্যাচার আর চলবে না। আরও রুটি চাই, প্রত্যেকের জন্য আরও সুযোগ সুবিধা চাই। আমাদের যুবক আহাম্মুকেরা সভা করে ইংরেজদের কাছ থেকে আরও ক্ষমতা নেবার চেষ্টা করছে। তারা কেবল হাসে। যে পরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে নিজে স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়। গোলাম অন্যকে গোলাম করবার জন্যই শক্তি বা ক্ষমতা চায়" (স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলি (ইং), ৪র্থ খণ্ড, পৃ ঃ ১১৩)। "ফার্স্ট ব্রেড অ্যান্ড দেন রিলিজিয়ান" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়)। আগে রুটি চাই, খাদ্য চাই, তারপর ধর্মের কথা বলব। বিবেকানন্দ বলছেন, "শুধু ভারতবর্ষের মানুষই নয়, একটা প্রাণীও যদি অনাহারে থাকে— আমার একমাত্র ধর্ম হবে তাদের খাওয়ানো।" "সো লং অ্যাজ ইভন এ সিঙ্গল ডগ ইন মাই কান্ট্রি হ্যাজ নো ফুড, মাই হোল রিলিজিয়ান উইল বি টু ফিড দেম"(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়)। বিজেপি-আর এস এস নেতারা এ সম্পর্কে কী বলবেন? এই বিবেকানন্দকে তাঁরা কি চেনেন? আমরা বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করি। তিনি বেদান্তে বিশ্বাসী ছিলেন, আর আমরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী। এখানে আমাদের মৌলিক পার্থক্য আছে। কিন্তু তিনি বড় মানুষ ছিলেন। তিনি ভোটের রাজনীতি করেননি, মিথ্যাচার করেননি। এমন কথা পর্যন্ত তিনি বলেছেন, সত্যিকারের দেশপ্রেমিক কে হবে? "জনগণ শত শতাব্দী ধরে অর্ধাশনে কাটাচ্ছে, তোমরা কি মনে প্রাণে বুঝছ অশিক্ষার কালো মেঘ ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, এই সব ভাবনা কি তোমাদের অস্থির করে তুলছে? তোমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে? এই চিন্তা কি তোমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করে তুলছে? দেশপ্রেমিক হওয়ার এই হল প্রথম সোপান" (বাণী ও রচনা—বিবেকানন্দ)। এই বিবেকানন্দকে গদিতে আসীন বিজেপি-আর এস এস নেতারা চেনেন?

প্রথমে আমি বলব, রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে এই জিগির তুলে একটা ঐতিহাসিক স্তম্ভ বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছে আরএসএস-বিজেপি। যদি

তালিবানরা অপরাধী হয়ে থাকে বামিয়ানের ঐতিহাসিক বুদ্ধমূর্তি ভেঙে, একই অপরাধে বিজেপি-আরএসএস অপরাধী। আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের সময়ও বাবরি মসজিদ ছিল। এই তিনজন তো হিন্দুধর্মের সর্বশেষ প্রচারক। বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ বলেছেন, ঈশ্বর, আল্লা, গড এক। একজনকেই আলাদা নামে ডাকা হয়। যেমন হিন্দুরা বলে জল, মুসলিমরা বলে পানি, খ্রিস্টানরা বলে ওয়াটার। রামকৃষ্ণ মসজিদে নামাজ পড়েছিলেন, গির্জায় প্রার্থনা করেছিলেন। এই চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কি যথার্থ হিন্দু ছিলেন? বিজেপি, আরএসএস নেতারা কী বলবেন?

গদির স্বার্থে রাম ও হনুমান পুজোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে

আজ হঠাৎ দাবি উঠেছে রামমন্দির চাই। রামনবমী উপলক্ষে তরোয়াল নিয়ে আস্ফালন হল। রামায়ণের রাম তো আমরা জানি তীর-ধনুক নিয়ে লঙ্কা জয় করতে গিয়েছিল। রাম তো তরোয়াল ব্যবহারও জানত না। এখানে রামভক্তরা তরোয়াল নিয়ে হাজির। কারণ কী? সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে। হিন্দুত্ব জাগাতে হবে, হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ জাগাতে হবে। আবার তার পাল্টা তৃণমূল হনুমান পুজা শুরু করল। রাম আর হনুমানের কম্পিটিশন চলল। তা আমি বলি, লঙ্কায় রাম যাকে ছাড়া জিততে পারত না, আপনারা সেই বিভীষণের পূজা করুন। যিনি ঘরের শত্রু বিভীষণ বলে কুখ্যাত। বিভীষণ ছাড়া রাম লঙ্কা জয় করতে পারত? বিভীষণেরও বদনাম ঘুচতো! এই সবই চলবে এখন আমাদের দেশে। অবশ্য বিজেপির প্রধানমন্ত্রী হয়ত দাবি করতে পারেন, তলোয়ার কেন, রামচন্দ্র আণবিক অস্ত্রের ব্যবহারও জানত! ওরা যুক্তি তুলছে, মুসলিমরা মহরম করছে, আমরা কেন রামনবমীতে তরোয়াল নিয়ে মিছিল করব না? আমরা বলি, মুসলিমরা বহুযুগ থেকে এ জিনিস করে আসছে, তখন তো আপনাদের এই রামভক্তি দেখা যায়নি। আজ হঠাৎ এই ভক্তি কোথা থেকে এল? নিজেদের শক্তি জাহির করা আর উত্তেজনা সৃষ্টি করা। এটা কি যথার্থ ধর্মভক্তি?

কোনও ধর্মপ্রচারকই অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে শেখাননি, অন্য ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ করতে শেখাননি। বুদ্ধ ও মহাবীরের কথা ভাবুন। যদিও এঁরা ভগবান মানতেন না। কিছু নীতি কথা ধর্ম হিসাবে প্রচার করেছিলেন। দু'জনেই অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস মতের প্রভাবে কলিঙ্গযুদ্ধের পর সম্রাট অশোক সকল যুদ্ধ ত্যাগ করে ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। যিশুখ্রিস্ট এমনকী তাঁর হত্যাকারীদের ক্ষমা করার উপদেশ দিয়েছিলেন, প্রতিশোধের কথা বলেননি। হজরত মহম্মদ তাঁর পূর্ববর্তী তিন জন

ধর্মপ্রচারককেও আল্লার প্রেরিত দূত গণ্য করে শ্রদ্ধা করতে বলেছেন, যদিও তাঁদের প্রচারিত ধর্মের সাথে হজরত মহম্মদের মতপার্থক্য ছিল। তিনি নিজে কাউকে আক্রমণ করেননি, আক্রান্ত হয়ে প্রতিরোধে লড়াই করেছিলেন। কোনও যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করতে দেননি ; এমনকী তাঁর ঘোরতর শত্রু মক্কার আবু সুফিয়ান, যে হজরত মহম্মদকে বহুবার হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, তাকেও বন্দি অবস্থায় হত্যা করতে দেননি। মদিনায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, পৌত্তলিকতাবাদীরা, ইহুদি, মুসলিম সকলেই নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মপালন করবে। কেউ কাউকে বাধা দেবে না।

ফলে কোনও ধর্ম প্রচারকই ধর্মীয় বিদ্বেষ বা ঘৃণা ছড়াননি। বরং বিপরীত কাজই করেছিলেন। কারণ সকলেই অসাধারণ বিরাট প্রতিভাবান মানবদরদি মানুষ ছিলেন, যা-কিছু করেছেন, সেই সময় অনুযায়ী মানুষের কল্যাণের জন্যই করেছেন ও ভেবেছেন।

কিন্তু যুগ ও সমাজ পাল্টায়। নতুন যুগে নতুন সমস্যা দেখা দেয়। নতুন যুগে নতুন সমাধান দেখা দেয়। ফলে এক যুগের সমাধান অন্য যুগে বা সমাজে কাজ করে না। একবার ভেবে দেখুন, আজকের যুগে যে সব সমস্যার আমরা সম্মুখীন হয়েছি, চাকরি-ছাঁটাই-বেকারিত্ব, মূল্যবৃদ্ধি-ট্যাক্স বৃদ্ধি, সরকারি দুর্নীতি-কালো টাকার কারবার, শিক্ষা ও চিকিৎসার সংকট, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কে ঠিক কে বেঠিক, নির্বাচনে কাকে ভোট দেব অথবা সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-ফ্যাসিবাদ ইত্যাদি কোনও প্রশ্ন নিয়ে কোনও আলোচনা বা সমাধান বাইবেলে, গীতায়, রামায়ণে, কোরাণে পাবেন? না, পাবেন না। কারণ তাঁরা যত বড় বড় চিন্তানায়কই হোন, তাঁদের যুগে এসব সমস্যা তাঁরা দেখেননি। কিন্তু তাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়তে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, এটা স্মরণে রেখে আজকের যুগের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজকের সত্য অনুযায়ী লড়তে হবে। এটাই হচ্ছে তাঁদের শিক্ষাকে যথার্থ অনুসরণ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজে এত অন্যায়-অত্যাচার-নিপীড়ন, অধর্ম-পাপ চলছে, কিন্তু সেজন্য কোনও গির্জা-মন্দির-মসজিদ থেকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় না, ধর্মীয় নেতারা শুধু ধর্মীয় প্রার্থনা, পূজা, নামাজকেই একমাত্র মহৎ কর্তব্য বলে মনে করেন। বরং দেখা যাচ্ছে, যত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাথাদের সাথে পুঁজিপতি-ব্যবসাদার-রাজনৈতিক নেতাদের দহরম মহরম বাড়ছে, যত এদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সক্রিয় উপস্থিতিতে ধর্মীয় উৎসব-মেলা বেড়েই চলছে ; ততই লক্ষ রাখবেন, ধর্মীয় বিচারেই যে সব কাজ অধর্ম, পাপ ও অনাচার, সেগুলি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এর উত্তর কী দেবেন?

অথচ সকল ধর্মের প্রচারকরাই তাঁদের যুগে এমন কোনও অন্যায় ছিল না, যার প্রতিবাদ করেননি। এজন্য তাঁরা কত নির্যাতিত হয়েছেন, অনাহারে দিন কাটিয়েছেন! আর এখন অধিকাংশ মন্দির-মসজিদ বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক— এই অর্থ মূলত জোগায় পুঁজিপতি-ব্যবসাদাররাই । অন্য সব সমস্যা নাহয় বাদ দিলাম, নারী ধর্ষণকে সব ধর্মই তো বলেছে পাপ। দেশে শিশু কন্যা-যুবতী-বৃদ্ধা নির্বিশেষে এত নিষ্ঠুর ধর্ষণ,গণধর্ষণ, খুন চলছে, কিন্তু কোনও ধর্মই কি এর প্রতিবাদে রাস্তায় নামছে ? বরং নির্ভয়ার ঘটনার পর আর এস এস প্রধান বলেছিলেন, 'এটা ইন্ডিয়ায় ঘটে, ভারতে ঘটে না'। অর্থাৎ শহরে ঘটে, গ্রামে ঘটে না। এটা কি সঠিক? আর একটা কথাও তারা বলেছেন, 'মেয়েরা লক্ষণ রেখা অতিক্রম করছে কেন'? অর্থাৎ মনুর বিধান অনুযায়ী মেয়েরা ঘরেই থাকবে, বাইরে বেরোবে না। এই হচ্ছে ওদের যুক্তি। অর্থাৎ বাইরে বেরোলে রাবণরা দুষ্কর্ম করবেই। এভাবে ভারতবর্ষকে মধ্যযুগের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ একটা ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য কী? এই ষড়যন্ত্রের একটা উদ্দেশ্যের মধ্যে হচ্ছে হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক সৃষ্টি। এও সাংঘাতিক জিনিস।

ভোট মানেই টাকার খেলা

আবার শুধু এতে হবে না, ভোটে জিততে হলে কালো টাকা চাই, কোটি কোটি কালো টাকা ছড়িয়ে ভোট কিনতে হবে। এই তো কালো টাকা উদ্ধারের নাম করে বিজেপি সরকার নোট বাতিল করল। তারপরই ইলেকশন কমিশন বলল, উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে যত কালো টাকা কাজ করেছে, আগে কোনও নির্বাচনে এতটা করেনি। লক্ষ করুন, নোট বাতিল করার পরেই কালো টাকার এত খেলা হল উত্তরপ্রদেশ ইলেকশনে। বাস্তবে নোট বাতিলে সাধারণ মানুষের কত হয়রানি হল, কতজন মারা গেল, আর বাস্তবে কালো টাকার গায়ে কি এতটুকু আঁচ লাগল? বরং যথারীতি অবাধে চলছে, আরও বাড়ছে। আটকাবে কে? সরকারি দলগুলিই তো জেনেশুনে প্রোটেকশন দিচ্ছে। কেন এতো কালো টাকা চাই? চাই ভোট কেনার জন্য। ভোটে জিততে কোটি কোটি টাকার খেলা চলে। এ টাকা জোগায় কে? জোগায় মালিকরা, কালো টাকার কারবারিরা, ব্যবসায়ীরা। এরা কখনও কংগ্রেসকে জেতায়, কখনও বিজেপিকে জেতায়। কোনও রাজ্যে এস পি-কে জেতায়, কখনও তৃণমূলকে জেতায়, কখনও বামফ্রন্টকেও জেতায়। যখন যাকে প্রয়োজন তাকে জেতায়। এখন টাকা ছাড়া ভোট হয় না। একমাত্র আমরা, আমাদের দল পাবলিকের থেকে চাঁদা নিয়ে দলের কাজকর্ম-আন্দোলন চালাই, ভোটও করি। আজকের এই মিটিং-এর জন্য গত

কয়েকদিন ধরে আমাদের কর্মীরা, রাস্তায় রাস্তায় চাঁদা তুলেছে, এ তো আপনারাই দেখেছেন। লোকে আমাদের বলে, 'পাগল, আপনারা চাঁদাও চান, আবার ভোটও চান। আর অন্যরা ভোট চায়, টাকা দেয়। এইজন্য আপনারা ভোটে জিততে পারেন না'। আমরা বলি আমাদের ওভাবে ভোটে জেতার দরকার নেই। আমরা আদর্শ বিক্রি করি না। আমরা নীতি আদর্শ ছাড়া চলার কথা ভাবতেই পারি না। তাই আমরা নীতি-আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ভোটে জিততে চাই না।

ফলে একদিকে কালো ও সাদা টাকার খেলা, তার সাথে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, এর সাথে যুক্ত হয়েছে জাত-পাত-ধর্ম-সম্প্রদায়ভিত্তিক ভোট ব্যাঙ্ক তৈরির হীন কৌশল, এসব দিয়ে ভোটে জেতা। তাই দেখছেন কখনও মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক বা হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক-এর জন্য, কোথাও আবার দলিত ভোটব্যাঙ্ক, আবার তার মধ্যে যাদব ভোটব্যাঙ্ক, কুর্মী ভোটব্যাঙ্ক এই রকম নানা ভোটব্যাঙ্ক-এর তাস খেলা হচ্ছে। গোটা ভারতবর্ষকে খণ্ড-বিখণ্ড করছে এইভাবে। একই মতলবে ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে তুলছে। এই হল একটা দিক।

হিন্দুর শত্রু মুসলিম নয়, মুসলিমের শত্রু হিন্দু নয়, উভয়ের শত্রু পুঁজিবাদ

আর একটা হচ্ছে হিন্দুদের মধ্যে বিদ্বেষ জাগানো। তুমি বেকার কেন? চাকরি জুটছে না কেন? তার কারণ এই মুসলিমরা এসে সব লুটেপুটে খাচ্ছে। এভাবে মুসলিম বিরোধী বিদ্বেষ জাগানো হচ্ছে। আরেকটা বিষয় দেখিয়ে হিন্দুদের মন বিষিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কোনও অপরাধে মুসলিম কেউ ধরা পড়লে অমনি হিন্দুত্ববাদীরা প্রচার তোলে মুসলিমরা সব খারাপ কাজ করে। এটা কি ঠিক? বাস্তবে নানা অপরাধে হিন্দু-মুসলিম উভয় ঘরেরই লোক যুক্ত থাকে। অপরাধী তো অপরাধীই, তার আবার হিন্দু-মুসলমান কী? কোনও ধর্ম কি এসব নোংরা অপরাধ করতে শেখায়? ফলে এসবে বিভ্রান্ত হবেন না। এ সবের উদ্দেশ্য হচ্ছে হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ জাগিয়ে দেওয়া। যেন, পুঁজিবাদ শত্রু নয়, মালিকরা শত্রু নয়। শত্রু হচ্ছে মুসলিমরা। আবার মুসলিমদের মাথারা বলছে, এই ভারতবর্ষে বাঁচতে হলে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এমন একটা দল বাছতে হবে, যার ছাতার তলায় গিয়ে দাঁড়ালে আমরা মুসলিমরা বাঁচতে পারি। এই কথা বলে মুসলিম মাথারাও মুসলিম ভোটকে কন্ট্রোল করে কখনও এই দলকে ভোট দিয়ে, কখনও ওই দলকে ভোট দিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে, আর সাধারণ জনগণ প্রতারিত হচ্ছে। এইভাবে জনগণের ঐক্য ভাঙছে। এই হচ্ছে আর একটা দিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে অধ্যাত্মবাদকে একদিন বুর্জোয়া শ্রেণি ফাইট করেছিল, এখন ওরাই সেই ধর্মীয় চিন্তা, অধ্যাত্মবাদী চিন্তা, ঈশ্বরতত্ত্ব, কপাল তত্ত্ব, অদৃষ্টবাদ সমাজমননে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। কর্মফলের কথা নিয়ে আসছে। ধনী কেন ওরা? ওরা পূর্বজন্মে পুণ্য অর্জন করেছে, তাই এত ধন-দৌলতের মালিক হয়েছে, গরিবকে মেরে লুটেপুটে খাওয়ার অধিকার ওদের দিয়েছে ভগবান। এসবই ওদের পুণ্যফল। আর পূর্বজন্মের পাপের ফলে শ্রমিকরা শোষিত হচ্ছে, জনগণ গরিব থাকছে। পূর্বজন্মে পাপ করেছে বলেই গরিবরা না খেয়ে মরছে, বিনা চিকিৎসায় মরছে, চাকরি পাচ্ছে না। চাকরি পেলেও ছাঁটাই হচ্ছে, দুঃসহ দারিদ্রে ছেলেমেয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে, নারীরা বাজারে পণ্য হচ্ছে, ধর্ষিতা হচ্ছে — এ সবই তাদের পূর্বজন্মের পাপের ফল। এগুলি বোঝানো হয়। কারণ 'তাঁর ইচ্ছাই কর্ম', 'ভগবানের বিধান কেউ কখনও খণ্ডাতে পারে না'। এইভাবে ধর্মকে ব্যবহার করার সমালোচনা করেই মার্কস উপরোক্ত বক্তব্যের শেষ লাইনে বলেছিলেন, 'ধর্ম হচ্ছে আফিং'। অর্থাৎ পুঁজিপতিরা ধর্মকে আফিং হিসাবে ব্যবহার করে গরিবদের ঠকাচ্ছে। শ্রমিক ও জনগণকে শোষণ করেই যে সম্পদের মালিক হয়েছে, এই মূল সত্যটা চাপা দেওয়াই এদের আসল মতলব। এসব ধারণা মেনে নেওয়াবার জন্য যুক্তিবাদী মনকে নষ্ট করে দিচ্ছে। প্রশ্ন কোরো না, তর্ক কোরো না, কর্মফল ভুগতেই হবে। বিনা প্রতিবাদে এই সব যুক্তি মেনে নাও, আর রাষ্ট্রনায়কদের অন্ধের মতো মানো। ক্ষমতাসীন দল ও নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে না, তর্ক করবে না। এইরকম একটা মানসিকতা জাগিয়ে তুলছে। এটা আজকের পুঁজিবাদের প্রয়োজন। শুধু বিজ্ঞান দরকার কারিগরি বিজ্ঞানের প্রয়োজনে। আজ এই ২৪ এপ্রিলের খবরের কাগজে পাবেন, গতকাল বিশ্বের ছ'শো শহরে বিজ্ঞানীরা মিছিল করেছেন। তাঁরা পুঁজিবাদের কবল থেকে বিজ্ঞানের মুক্তি চাইছেন, রাষ্ট্রনায়কদের হস্তক্ষেপ থেকে বিজ্ঞানের মুক্তি চাইছেন। কারণ বিজ্ঞানের প্রগতিতে পুঁজিবাদ আজ বাধা সৃষ্টি করছে। পুঁজিবাদ চাইছে বিজ্ঞান চর্চা হবে শুধু যন্ত্রের আর অস্ত্রের জন্য। মৌলিক বিজ্ঞানের চর্চা নয়, শুধু টেকনিক্যাল বিজ্ঞানের চর্চা হোক। আর বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক মনন, প্রশ্ন করা, তর্ক করা, কার্য-কারণ সম্পর্ক জানতে চাওয়া, ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা, এসব চলবে না। শুধু. চলবে নির্বিবাদে পুঁজিপতিদের নির্মম শোষণ এবং শাসন। ফ্যাসিবাদী মনন গড়ে তোলার জন্যই পুঁজিবাদীরা আজ ধর্মান্ধতা জাগিয়ে তুলছে। এটাই আজ তাদের প্রয়োজন।

আর চাই জনগণের ঐক্য ভাঙার জন্য বিভেদ সৃষ্টি। হিন্দুর শত্রু মুসলিম,

মুসলিমের শত্রু হিন্দু, উচ্চ বর্ণের শত্রু নিম্ন বর্ণ, নিম্ন বর্ণের শত্রু উচ্চ বর্ণ। মহারাষ্ট্রের শত্রু অন্য রাজ্যের লোকেরা। আবার ওড়িশার বা আসামের শত্রু বাইরে থেকে যারা ওইসব রাজ্যে আসছে তারা। এক প্রদেশের জনগণ অন্য আর একটা প্রদেশে ঢুকতে পারবে না। এক প্রদেশের জনগণের বিরুদ্ধে অন্য প্রদেশের জনগণকে খেপিয়ে দাও। এইভাবে গোটা দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিচ্ছে। একমাত্র লক্ষ্য জনগণের ঐক্য নষ্ট করা, আর তার সুযোগে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করা।

হিন্দু ধর্মের প্রবক্তারা গোহত্যা বন্ধের দাবি তোলেননি

এর সাথে যুক্ত হয়েছে আর একটা স্লোগান— 'গোহত্যা' বন্ধ করতে হবে। যে স্লোগান অতীতে হিন্দু ধর্মের প্রবর্তকরা কোনওদিন তোলেননি। আজ এইসব ধুয়া তুলে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এ সম্পর্কে আমি এখানে বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত থেকে কয়েকটি উদাহরণ পড়ে শোনাচ্ছি। ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে— "তুমি আমার জন্য ১৫-২০টি বৃষ রান্না করে দাও, আমি তা খেয়ে আমার উদরের দু'দিক পূর্ণ করি, আমার শরীর স্থূল করি" (ঋক বেদে সংহিতার দশম মণ্ডল ছিয়াশি সূক্তর চৌদ্দ মন্ত্র ঃ মহাকাব্য ও মৌলবাদ-- জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্ম ও খাদ্য, পৃ ১১৭)। ইন্দ্রের কাছে আর এক প্রার্থনায় বলা হয়েছে— "গো-হত্যার স্থানে যেমন গরুরা হত হয়, আমাদের শত্রু রাক্ষসেরা যেন তোমার অস্ত্রের দ্বারা নিহত হয়ে পৃথিবীতে শয়ন করে।' (দশম মণ্ডল উননব্বই সূক্ত চৌদ্দ মন্ত্র) । এর দ্বারা বোঝাই যায়, ঋষিরা তখন গোমাংস খেত। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের অনুশাসন উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, গরুর মাংস যদি নরম হয় তাহলে তা খাওয়া যেতে পারে— "হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোশ্নাম্যেবাহমংসলং চেদ্ভবতি" (শতপথ ব্রাহ্মণ কাণ্ডের তৃতীয় খণ্ডে এক নং অব্দে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের একুশ মন্ত্র, ওই)। এখানে বলা হচ্ছে যজ্ঞে গোরুর মাংস দেওয়া হত। বাল্মিকী রামায়ণের কথা বললে রামভক্তরা হয়তো আমার মাথায় ডান্ডা মারবে। শুনুন কী বলা হয়েছে— 'বনগমনের পথে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলে মুনিবর বৃষ এবং ফলমূল দিয়ে তাঁদের ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন।' (বাল্মিকী রামায়ণ, ২ কাণ্ড ৫৪ সর্গ, ওই)। তখন গোমাংস খাইয়ে অতিথি আপ্যায়ন হত। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের মধ্যে গোমাংসের প্রচলন ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম এবং জৈন ধর্ম আসার পর প্রাণীহত্যা বন্ধ হয়ে যায়। তারও পরে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে গোমাংস বন্ধ হয়ে যায়। হয়তো তার কোনও অর্থনৈতিক কারণ

ছিল। চাষ-বাস বা অন্যান্য ব্যবহারিক প্রয়োজনে গোহত্যা বন্ধ করা হয়েছিল। এর সাথে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই।

গোহত্যা নিষিদ্ধ করার কথা বিবেকানন্দও বলেননি। বরং স্বামী-শিষ্য সংবাদে আছে, বিবেকানন্দ শিষ্যদের নিয়ে বসে আছেন সেখানে তাঁর কাছে চাঁদা চাইতে গিয়েছিল গোরক্ষণী সভার জনৈক প্রচারক। বিবেকানন্দ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন,— "তোমাদের উদ্দেশ্য কী? প্রচারক ঃ আমরা দেশের গোমাতাগণকে কসাইয়ের হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকি। স্থানে স্থানে পিঁজরাপোল স্থাপন করা হইয়াছে। সেখানে রুগ্ন, অকর্মণ্য এবং কসাইয়ের হাত হইতে ক্রীত গোমাতাগণ প্রতিপালিত হন। বিবেকানন্দ ঃ এ অতি উত্তম কথা। আপনাদের আয়ের পন্থা কি? প্রচারক ঃ দয়াপরবশ হইয়া আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষ যাহা কিছু দেন, তাহা দ্বারাই সভার ঐ কাজ নির্বাহ হয়। বিবেকানন্দ ঃ আপনাদের গচ্ছিত কত টাকা আছে? প্রচারক ঃ মারোয়াড়ী বণিকসম্প্রদায় এ কার্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা এই সৎকার্যে বহু অর্থ দিয়াছেন। বিবেকানন্দ ঃ মধ্য-ভারতে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ভারত গভর্নমেন্ট নয় লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর তালিকা প্রকাশ করেছেন। আপনাদের সভা এই দুর্ভিক্ষ-কালে কোনও সাহায্যদানের আয়োজন করেছে কি? প্রচারক ঃ আমরা দুর্ভিক্ষাদিতে সাহায্য করি না। কেবলমাত্র গোমাতাগণের রক্ষাকল্পেই এই সভা স্থাপিত। বিবেকানন্দ ঃ যে দুর্ভিক্ষে আপনাদের জাতভাই লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হল, সামর্থ্য সত্ত্বেও আপনারা এই ভীষণ দুর্দিনে তাদের অন্ন দিয়ে সাহায্য করা উচিত মনে করেননি? প্রচারক ঃ না। লোকের কর্মফলে — পাপে এই দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; যেমন কর্ম তেমনি ফল হইয়াছে।

প্রচারকের কথা শুনিয়া বিবেকানন্দের বিশাল নয়নপ্রান্তে যেন অগ্নিকণা স্ফুরিত হইতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইল; কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন ঃ যে সভা-সমিতি মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনশনে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্য একমুষ্টি অন্ন না দিয়ে পশুপক্ষী-রক্ষার জন্য রাশি রাশি অন্ন বিতরণ করে, তার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই; তার দ্বারা সমাজের বিশেষ কিছু উপকার হয় বলে আমার বিশ্বাস নেই। কর্মফলে মানুষ মরছে— এরূপে কর্মের দোহাই দিলে জগতে কোনও বিষয়ের জন্য চেষ্টাচরিত্র করাটাই একেবারে বিফল বলে সাব্যস্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষার কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে— গোমাতারা নিজ নিজ কর্মফলেই কসাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন, আমাদের ওতে কিছু করবার প্রয়োজন নেই। প্রচারক ঃ (একটু অপ্রতিভ হইয়া) হ্যাঁ, আপনি যাহা বলিয়াছেন,

তাহা সত্য; কিন্তু শাস্ত্র বলে— গরু আমাদের মাতা। বিবেকানন্দ ঃ (হাসিতে হাসিতে) হ্যাঁ, গরু আমাদের যে মা, তা বিলক্ষণ বুঝেছি— তা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?

কথা শুনিয়া প্রচারক মহাশয় স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন বিবেকানন্দ আমাদিগকে বলিলেন ঃ

বিবেকানন্দ ঃ কি কথাই বললে। বলে কিনা — কর্মফলে মানুষ মরছে, তাদের দয়া করে কী হবে? দেশটা যে অধঃপাতে গেছে এই তার চূড়ান্ত প্রমাণ। তোদের হিন্দুধর্মের কর্মবাদ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখলি? মানুষ হয়ে মানুষের জন্যে যাদের প্রাণ না কাঁদে, তারা কি আবার মানুষ? এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর সর্বাঙ্গ যেন ক্ষোভে দুঃখে শিহরিয়া উঠিল" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, ৯ম খণ্ড)। লক্ষ করুন, স্বয়ং বিবেকানন্দ 'গো-রক্ষাকারীদের' কী তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

আজ গোটা দেশে বিজেপি-আরএসএস এমন পরিবেশ সৃষ্টি করছে যেন এখন একমাত্র কর্তব্য অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠা আর গোহত্যা বন্ধ করা। ধরা যাক, ধর্মের নামে এই দুটো জিনিস করা হল। তাহলে দেশে বেকার থাকবে না? কলকারখানা বন্ধ হবে না? ছাঁটাই হবে না? জিনিসপত্রের দাম বাড়বে না? ট্যাক্স বাড়বে না? ভাড়া বাড়বে না? মানুষের জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? বিজেপি-আরএসএস এসব কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না। এই মূল প্রশ্নগুলি চাপা দেওয়ার জন্য রামমন্দির আর গোহত্যা বন্ধের স্লোগান তুলেছে। এটা অত্যন্ত হীন উদ্দেশ্যমূলক।

অবিভক্ত সিপিআই মার্কসবাদের চর্চা করলে এস ইউ সি আই (সি) গড়ে তোলার প্রয়োজন হত না

পশ্চিমবাংলার একটা বিরাট গৌরবজনক ঐতিহ্য ছিল। ইতিপূর্বেই বলেছি, ভারতীয় নবজাগরণের সূর্যোদয় হয়েছিল অবিভক্ত বাংলায়। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সূচনা করেছিলেন। সেই পথেই একের পর এক আগমন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল প্রমুখ মনীষীদের। সেই পথে স্বদেশি আন্দোলনে দেশবন্ধু-বিপিনচন্দ্র পাল-সুভাষ চন্দ্র বোস-ক্ষুদিরাম-বাঘাযতীন-সূর্য সেন-প্রীতিলতা সহ অসংখ্য শহিদ আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। বাংলা ছিল বিপ্লববাদের কেন্দ্রস্থল। এক দিকে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, চীনে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, এসবের প্রভাব এবং অন্যদিকে

অবিভক্ত বাংলার গৌরবময় বিপ্লববাদের প্রভাব— এসব নিয়েই বামপন্থী আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে শক্তিশালী হয়েছিল পাঁচের, ছয়ের দশকে। যা দিয়ে অবিভক্ত সিপিআই-এর শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অবিভক্ত সিপিআই কোনও দিনই যথার্থ মার্কসবাদের চর্চা করেনি। ওরা প্রকৃত মার্কসবাদের চর্চা করলে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টি গড়ে তোলার প্রয়োজন হত না, এই কঠিন সংগ্রাম করতে হত না। এদের ইতিহাস গোটা স্বদেশি আন্দোলনে মার্কসবাদ বিরোধী কার্যকলাপের ইতিহাস। ১৯২৫ সালে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্ণধার মহান স্ট্যালিন ভারতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের মতো উপনিবেশে চীনের তুলনায় পুঁজিবাদ যথেষ্ট শক্তিশালী এবং সর্বহারা শ্রেণিও ব্যাপক পরিমাণে বেড়েছে। ফলে এই দেশে ইতিমধ্যেই জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি আপসকামী ও বিপ্লবী এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে। আপসকামী বুর্জোয়ারা স্বাধীনতার চেয়েও নিজেদের টাকার থলির প্রতিই অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে, ফলে তারা সাম্রাজ্যবাদের থেকেও শ্রমিক বিপ্লবকে বেশি ভয় পাচ্ছে এবং সে কারণে সাম্রাজ্যবাদের সাথে বোঝাপড়া করছে। এসব উল্লেখ করে ভারতের কমিউনিস্টদের কর্তব্য নির্ধারণ করে স্ট্যালিন বলেছিলেন, "the communist party can and must enter into an open bloc with the revolutionary wing of the bourgeoisie in order, after isolating the compromising national bourgeoisie, to lead the vast masses of the urban and rural petty bourgeoisie in the struggle against imperialism" (Stalin– Collected Works, Vol-7)। এদেশের মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের প্রতিনিধি ছিলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু সিপিআই সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেনি। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতিত্ব থেকে সুভাষচন্দ্রকে সরাবার ষড়যন্ত্রে সামিল হয়েছিল দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদীদের সাথে কমিউনিস্ট পার্টি। দুঃখ করে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "ত্রিপুরীতে আমার পরাজয় হল। এই পরাজয় হচ্ছে একদিকে রোগশয্যায় শায়িত একজন ব্যক্তি আর অন্য দিকে ১২ জন বাঘা বাঘা কংগ্রেস নেতা, সাতটি রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং সর্বোপরি গান্ধীজির মতো একজন নেতার নাম, ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাব"(ক্রসরোডস, নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো)। তিনি আরও বললেন, "এ ছাড়া এদের সাথে যুক্ত হল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাদের সাথে হাত মিলিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি" (ওই)। তারপরেও তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে আহ্বান করেছিলেন লেফট কনসোলিডেশন-এর জন্য অবিভক্ত বিহারের রামগড়ে সম্মেলনে। তারা সামিল হয়নি। এ নিয়েও দুঃখ করে বলেছিলেন, কমিউনিজমের মতো মহান আদর্শ ভারতবর্ষে জায়গা করতে পারল না, কারণ এদেশে কমিউনিস্ট বলে যারা পরিচিত তাদের নীতি ও

কর্মপদ্ধতি এমন, তারা মিত্রকে শত্রু বানিয়ে ফেলে, কাছে টানার পরিবর্তে দূরে ঠেলে দেয়। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদীদের ষড়যন্ত্রে সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। সিপিআই যদি সেদিন তাঁকে সমর্থন করত ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য রকম হয়ে যেত। ভারতবর্ষে বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, আইএনএ-র লড়াই, নৌ-বিদ্রোহ এগুলিকে ভিত্তি করে যদি একটি যথার্থ মার্কসবাদী দল সঠিক পথে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করত তাহলে বুর্জোয়ারা হয়ত ক্ষমতা হস্তগত করতে পারত না। শত শহিদের আত্মদানে গৌরবান্বিত স্বাধীনতা আন্দোলন ট্রাজিক পরিণতির দিকে যেত না। কিন্তু সেই দল ছিল না বলেই কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রকৃত সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) গড়ে তোলেন।

উন্নত চরিত্রের মান বিপ্লবী সংস্কৃতির প্রাণ

তিনি দেখিয়েছেন, সিপিআই ও পরবর্তীকালে সিপিএম নেতারা মার্কসবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেননি, এদেশের মাটিতে, এই দেশের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগ করতে পারেননি। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চরিত্র, দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিচার করে, মার্কসবাদের বিশেষীকৃত রূপ কী হবে সেটা নির্ধারণ করতে পারেননি। রাশিয়ায় লেনিন এটা করেছিলেন, যাকে আমরা লেনিনবাদ বলি। চীনে মাও সে-তুঙ এটা করেছিলেন, যা মাও সে-তুঙের চিন্তাধারা হিসাবে পরিচিত। ভারতবর্ষের সিপিআই এই কাজটি করতে পারে নি। ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ শক্তিশালী হয়ে একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্তরে এসে লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়ে ও মাল্টিন্যাশনালের অংশীদার হয়ে সাম্রাজ্যবাদীতে পরিণত হয়েছে, বিদেশে পুঁজি ইনভেস্ট করছে— এ সত্য তারা স্বীকার করতে চায় না। তাই পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিবর্তে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব আজও তারা আওড়ে যাচ্ছে। এই রকমই তাদের মার্কসবাদের উপলব্ধি! তারা কোনও দিন কমিউনিস্ট সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার চর্চা করেনি। কমিউনিজম শুধু ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাবে তাই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিবাদ থেকেও মুক্ত হবে। বিপ্লবের স্বার্থই ব্যক্তির স্বার্থ, সমাজের স্বার্থই ব্যক্তির স্বার্থ। ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থ বলে কিছু থাকবে না, শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পত্তিমুক্ত হওয়া নয়, পরিবার-স্নেহ-প্রেম-প্রীতি সব ক্ষেত্রেই, আচারে-ব্যবহারে ব্যক্তিস্বার্থ মুক্ত হতে হবে। এটাই উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের মান এবং এই চিন্তা এনেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদের ভিত্তিতে। এইসব জিনিসের চর্চা তারা

করেনি। আমাদের দলের কর্মীদের মধ্যে এই চর্চা আছে এবং তা জীবন্ত ও সজীব রাখতে আমরা সচেষ্ট। আমাদের যারা বিরোধী তারাও বলে আমাদের দলের ছেলেমেয়েরা ভাল, ভদ্র এবং সুশালীন। আমাদের দলের কর্মীরা হাসিমুখে এত কষ্ট করে কীসের জোরে? সেই শক্তি হল কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। তিনি বলেছেন, উন্নত চরিত্রের মান বিপ্লবী রাজনীতির প্রাণ। আমাদের দলে এর একটা জীবন্ত চর্চা আছে। সে ভাবে কর্মীরা গড়ে উঠছে। এসব জিনিসের চর্চা সিপিআই কোনও দিন করেনি। যখন সিপিআই পাঁচের দশকে লড়াই করত, আন্দোলন করত, তাদের নেতা-কর্মীরা জেলে যেত তখনও কমিউনিস্ট সংস্কৃতির চর্চা করা তো দূরের কথা, জনগণের মধ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক মানসিকতা — এগুলির বিরুদ্ধেও তারা লড়াই করেনি। উপর উপর একটা বামপন্থা ছিল। কিন্তু মনন জগতে মানুষকে মার্কসবাদী চিন্তার আলোকে যে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার দরকার ছিল, সেটা তারা দেয়নি। হিন্দু নয়, মুসলিম নয়, বাঙালি নয়, বিহারী নয়, অসমিয়া নয়— জাত দু'টি, শ্রমিক আর মালিক, ধনী আর গরিব, শোষক আর শোষিত। এই শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ছিল, তারা তা দেয়নি। এই মৌলিক দুর্বলতা নিয়েই বামপন্থী আন্দোলন একভাবে চলেছিল। তারপর তারা ক্ষমতায় এল। ক্ষমতায় এসে সরকার চালাল সম্পূর্ণ অমার্কসবাদী আর বামপন্থা বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। কমিউনিস্টরা পার্লামেন্টারি নির্বাচনে যায় কেন? লেনিন বলেছেন, যতক্ষণ পার্লামেন্ট আছে, জনগণের মধ্যে পার্লামেন্ট সম্পর্কে মোহ আছে, যতক্ষণ জনগণ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত না হচ্ছে, পার্লামেন্ট সম্পর্কে মোহমুক্ত করার জন্যই ততক্ষণ কমিউনিস্টদের পার্লামেন্টে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। পার্লামেন্টে গিয়ে মেজরিটি হলে বা সরকার গড়লে কমিউনিস্টরা কী ভূমিকা পালন করবে, তা লেনিন দেখাননি, কারণ তাঁর সময় এই প্রশ্ন আসেনি। এ বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, মেজরিটি হয়ে কোনও রাজ্যে সরকার গড়লে সেই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হবে— যেনতেন প্রকারে মন্ত্রীত্বের গদি আঁকড়ে থাকা নয়, বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা নয়, যতটুকু সময় ও সুযোগ পাওয়া যাবে শ্রেণি সংগ্রামকে, গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করাই হবে মূল লক্ষ্য। তাতে যদি রাষ্ট্র বা কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতাচ্যুত করে, তার দ্বারা জণগণ রাষ্ট্র ও কেন্দ্রীয় সরকারের এবং সংবিধানের বুর্জোয়া শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে সজাগই হবে। এটাই যথার্থ কমিউনিস্টরা চায়। লেনিনের শিক্ষার তাৎপর্য এটাই।

বামফ্রন্ট ৩৪ বছর এ রাজ্যে শাসন করেছে। ৩৪ বছর ওদের শাসনের সাথে কংগ্রেস শাসন, বিজেপি শাসন, তৃণমূল শাসনের কোনও পার্থক্য ছিল না। পাঁচের দশকে ছয়ের দশকে যখন তারা সরকারে ছিল না, এই সিপিআই বা সিপিএম ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত যতটুকু তাদের লড়াইয়ের মনোবল ছিল, ক্ষমতায় আসার পর, ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার পর সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক চরিত্র উদঘাটন হতে শুরু করল এবং ধীরে ধীরে তারা শ্রেণিসংগ্রাম ও গণআন্দোলন দমনে বুর্জোয়া শ্রেণির হাতিয়ারে পরিণত হল।

বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসন বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছে

পশ্চিমবাংলায় ৩৪ বছর ধরে একমাত্র আমাদের পার্টি লড়াই করেছে বামপন্থা ও মার্কসবাদের ঝান্ডা নিয়ে। সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের ১৬১ জন নেতা-কর্মী শহিদ হয়েছেন। আপনারা জানেন, প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ভাষা পুনঃপ্রবর্তন করার জন্য ১৮ বছর লড়াই করতে হয়েছে আমাদের। বহু দাবি আমরা আদায় করেছিলাম আন্দোলন করে। সিপিএম ৩৪ বছরের শাসন যদি শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিতে চালাত তাহলে বামপন্থার শক্তি বাড়ত। ভারতবর্ষে তার প্রভাব বাড়ত, শ্রেণিসংগ্রাম তীব্রতর হত। তার বদলে তারা শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি নষ্ট করেছে এবং দলের কর্মীদেরও যে মনোবল ছিল তাকে নষ্ট করে সুবিধাবাদে পর্যবসিত করেছে। যে মুহূর্তে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে সেই মুহূর্তে সিপিএমের দশা দেখুন। এত বড় দল যেন চুপসে গেছে। সরকারে না থাকলে তাদের কর্মীরা কাজে নামতে সাহস পায় না। আজ তাদের সরকার নেই, কর্মীরা বিশেষ সাড়া দেয় না। কর্মীদের সে মনোবল নেই। সরকারে থেকে একদিকে অন্যান্য বুর্জোয়া দলের মতোই দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে কাজ করেছে, অন্যদিকে প্রশাসন-পুলিশ ও সমাজবিরোধীদের দিয়ে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করেছে, সর্বত্র ভয়ভীতি-সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, নানারকম দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কোনও আদর্শ বা নীতি দিয়ে নয়, সরকারি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে, প্রমোটারি, কনট্রাক্টরি, লাইসেন্স, পারমিট দিয়ে দলবল বাড়িয়েছে। পুলিশ-প্রশাসন-বিদ্যায়তন সর্বত্র দলীয় আধিপত্য কায়েম করেছে। এভাবে বামপন্থাকে তারা কলঙ্কিত করেছে, মার্কসবাদকে কলঙ্কিত করেছে। **কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৬৮ সালে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, তোমরা বামপন্থাকে কলঙ্কিত করছ। এর সুযোগ নেবে জনসংঘ। তিনি গভীর উদ্বেগে বলছেন, "এই পরিস্থিতিতে জনসংঘের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্রীয়তাবাদীরা ওত পেতে বসে আছে। তারা সুযোগের অপেক্ষা করছে। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ আজও রয়েছে তা নষ্ট হয়ে গেলেই তারা আত্মপ্রকাশ করবে। এ কথাটা ক্ষমতাসীন সিপিএম নেতারা বুঝছেন না। তাঁরা কমিউনিজমের আদর্শ, মূল তত্ত্ব বাদ দিয়ে প্রায় কংগ্রেসের মতো বড় বড় বুকনি আর মিষ্টি কথার চালাকিতে জনতাকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন। এইভাবে কমিউনিজমের সুনামকে নষ্ট করে দিয়ে তাকে কালিমালিপ্ত করছেন"** (যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি ও পার্টির সাংগঠনিক কাজ কর্মের কয়েকটি দিক, শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড)।

দ্বিতীয়ত, তারা কোনও দিনই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মানুষের মনন গড়ে তোলেনি। কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে কমিউনিস্ট মতাদর্শের কোনও প্রভাব গড়ে তোলেনি। যারা তাদের হয়ে কাজ করত, ভোট দিত, তাদের মধ্যেও যে প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা ছিল এবং এসব চিন্তা নিয়েই তারা সিপিএম জিন্দাবাদ করত, বা অবিভক্ত সিপিআই জিন্দাবাদ করত, নেতৃত্ব এ বিষয়ে সজাগ ছিল না। আজকে তার ফল সিপিআই, সিপিএমকে ভুগতে হচ্ছে! এমনকী তাদের বেশকিছু কর্মী-সমর্থক বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে। এতে বামপন্থী আন্দোলনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তৃণমূলেরও হিসাব ভোটব্যাঙ্ক

অন্য দিকে তৃণমূলের শাসনও সিপিএম শাসনের মতো একই রকম। যার জন্য আগেই আমি বলেছিলাম তৃণমূলের শাসন হচ্ছে সিপিএম সরকারের কার্বন কপি। সর্বত্র দলীয় কাজে পুলিশ-প্রশাসনকে লেজুড়ের মতো ব্যবহার করছে, আর সমাজবিরোধীদের বেপরোয়া দৌরাত্ম্য চলছে। তাদের রাজত্বে ঘুষ ও কাট-মানি নেওয়া, তোলাবাজি, খুন, নারী-পাচার, ধর্ষণ বাড়ছেই। এইগুলি বন্ধ করার জন্য রাজ্যে কোনও সরকার আছে বলে মনেই হয় না। সিপিএম সরকারের পথে মদের ব্যবসাও বাড়িয়ে চলেছে। দুর্নীতিও অবাধে চলছে। একের পর এক নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছেই, গ্রেপ্তারও হচ্ছে অনেকে, এর যেন শেষ নেই। এই পরিবর্তনই কি চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের জনগণ! এই প্রশ্ন আজ হতাশাচ্ছন্ন মানুষের মুখে মুখে।

সিপিএম নেতারা এক সময় ভেবেছিলেন তাদের শাসন এভাবেই চিরস্থায়ী হবে। আজ তাদের কী দুরবস্থা! তৃণমূল নেতারা এর থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন না। ভেবে দেখছেন না, একবার ক্ষমতাচ্যুত হলে তাঁদেরও অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তৃণমূলেরও হিসাব তাদের ভোটব্যাঙ্ক। তারা জানে বেশ কিছু হিন্দু ভোট পাবই। টাকা দিয়ে হোক, নানা মিথ্যাচার করে হোক, সাইকেল, যুবশ্রী,

কন্যাশ্রী, অমুকশ্রী, ক্লাবে অনুদান— এইসব দিলে ভোট এসে যাবে। যেটা চাই, তা হল মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখা মোয়াজ্জেম ভাতা ইত্যাদি দিয়ে। আর এটাকেই দেখিয়ে আরএসএস, বিজেপি মাথা তুলছে এই বলে যে,পশ্চিমবাংলায় মুসলিমদের তোয়াজ করা হচ্ছে। আমি প্রশ্ন করি, ক'জন মুসলিম চাকরি পেয়েছে তৃণমূলের রাজত্বে? ক'জন মুসলিম শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে? হিন্দুদের মধ্যে যত বেকার, মুসলিমদের মধ্যেও সেই বেকার। কারও কোনও বিশেষ সুবিধা বলে কিছুই হয়নি। মানুষকে বুঝতে হবে এগুলো বিষাক্ত চিন্তা। আসলে সমাজ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত— মালিক আর শ্রমিক, শোষক আর শোষিত। মুসলিমদের জন্য আলাদা চাকরি, হিন্দুদের জন্য আলাদা চাকরি নেই। মুসলিমদের জন্য জিনিসপত্রের দাম আলাদা, হিন্দুদের জন্য জিনিসপত্রের দাম আলাদা নেই। রেলভাড়া বাসভাড়া হিন্দুদের জন্য আলাদা, মুসলিমদের জন্য আলাদা নয়। শিক্ষার ব্যয়, হাসপাতালের চার্জ মুসলিমদের জন্য আলাদা, হিন্দুদের জন্য আলাদা নয়। জীবনের সমস্যা সকলেরই এক। সকলেই শোষিত অত্যাচারিত। এ জন্যই আমরা শোষিত জনগণের ঐক্য চাই। এই ঐক্যের জন্য আমাদের দল লড়ছে।

এস ইউ সি আই (সি) বরাবর বামপন্থী ঐক্য চেয়েছে, ভেঙেছে সিপিএম

পশ্চিমবাংলায় আমরা বামপন্থী ঐক্য চাই। বামপন্থী ঐক্য ভেঙেছিল সিপিএম ১৯৭৪ সালে, জয়প্রকাশ (জেপি) মুভমেন্টের সময়। যখন ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল। আমরা সে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলাম। সে আন্দোলনে আমরা সিপিএম-সিপিআইকে থাকতে বলেছিলাম। সেই আন্দোলন ছিল রুটি-রুজি-চাকরির দাবিতে। সিপিএম-সিপিআই সামিল হয়নি জনসংঘ-আরএসএস থাকার অজুহাত তুলে। যদিও তারা পরবর্তীকালে বিজেপি-র সাথে দু'বার হাত মিলিয়েছে 'স্বৈরাচারের' বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে ভোটের স্বার্থে। আর সিপিএম-সিপিআই জেপি আন্দোলনে না থাকায় সমস্ত ফয়দাটা আত্মসাৎ করে জনসংঘ-আর এস এস শক্তি বাড়াল। তখন আমরা চেয়েছিলাম বামপন্থীরা সম্মিলিতভাবে এর নেতৃত্ব দিক। ওদের সাথে কংগ্রেসের দহরম মহরম ছিল। তার জন্য এই আন্দোলন হল না। আমরা সমালোচনা করায় আমাদের সাথে ঐক্য ভাঙল।

ধর্মের সাথে রাজনীতি মেশানোর তীব্র বিরুদ্ধতা করেছেন সুভাষচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে, ধর্মের সাথে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক থাকবে না। উনি বলছেন, "এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী লোক ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থলোভে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে (হিন্দু ও মুসলিম) কলহ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে— স্বাধীনতা সংগ্রামে এ শ্রেণির লোককেও শত্রু গণ্য করা প্রয়োজন" (সুভাষ রচনাবলি,২য় খণ্ড)। ১৯৩৯ সালে বোম্বাইতে ফরওয়ার্ড ব্লকের অধিবেশনে বলেছিলেন, "ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি হইতে বাদ দেওয়া উচিত। ... ধর্মীয় কিংবা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত নয়, ইহা পরিচালিত হওয়া উচিত শুধু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা" (সুভাষ রচনাবলি, ৫ম খণ্ড)। হিন্দুত্ববাদীদের তীব্র নিন্দা করে ১৯৪০ সালে ঝাড়গ্রামে এক সভায় নেতাজি বলেছিলেন, "প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা হিন্দু মহাসভার নামে রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়া উহাকে কলুষিত করিয়াছেন। ... সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের ত্রিশুল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠাইয়াছেন। ত্রিশুল ও গৈরিক বসন দেখিলে হিন্দুমাত্রই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়া ধর্মকে কলুষিত করিয়া হিন্দু মহাসভা রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে। হিন্দু মাত্রেরই তাহার নিন্দা করা কর্তব্য"(১৪মে ১৯৪০, আনন্দবাজার পত্রিকা)। নেতাজি বেঁচে থাকলে আজ বিজেপি ও আরএসএস-এর রাজনীতি নিয়ে কী বলতেন? কীভাবে দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করা যায় এই প্রসঙ্গে নেতাজি একথাও বলেছিলেন, "দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার ক্যান্সার নির্মূল করা ... বর্তমান অবস্থায় প্রায় অসম্ভব মনে হতে পারে। কিন্তু এই কাজই অনেক সহজ হয়ে যাবে যদি একটিবার আমরা সমগ্র জাতিকে জড়িয়ে বিপ্লবী মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে পারি" (ক্রসরোডস, নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো)। সুভাষচন্দ্রের আইএনএ বাহিনীর জেনারেল ছিলেন, শাহনওয়াজ খান। একসময় ভারতবর্ষ তোলপাড় হয়েছিল, আই এন এ বাহিনীর কর্নেল রশিদ আলিকে ব্রিটিশ সরকার ফাঁসি দেবে বলে ঘোষণা করায়। গোটা ভারতবর্ষে আগুন জ্বলেছিল। হিন্দ-মুসলিম সকলেই গর্জে উঠেছিল। সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীতে হিন্দু-মুসলিম কোনও পার্থক্য ছিল না। এটা খুবই দুঃখের যে, সেই ভারতবর্ষেই আজ আরএসএস জায়গা করছে, বিজেপি জায়গা করছে। গোটা ভারতবর্ষে আজ এটা একটা বিপদ। এটাও আপনাদের জানা দরকার, সুভাষচন্দ্র, আগাগোড়া সত্যানুসন্ধানী ছিলেন। তিনি প্রথমে বেদান্ত ও পরে হেগেলিয়ান দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। পরে তিনি বস্তুবাদের প্রতি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আকৃষ্ট হন। পূর্বেকার বস্তুবাদ

সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা মুক্ত হন। দেশত্যাগের আগে আলিপুর জেলে বন্দি অবস্থায় তিনি কিছু দাবিতে আমরণ অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। সেই সময় ছাত্র-যুবকদের উপদেশ দিয়ে একটি বার্তা পাঠান— "আমি যখন থাকব না, আমার ইচ্ছা এটি তাদের পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে, যাঁরা জীবনের গভীরতর সমস্যা সম্পর্কে উৎসুক ...পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপের প্রশ্নে, অদ্যাবধি বিজ্ঞানের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি, তা জেনে আমাদের খোলা মনে থাকাই বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও সত্য প্রকট হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে আমাদের মনে রাখা উচিত বস্তুবাদ সম্পর্কে আগেকার ধারণা সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেছে। একদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অন্যদিকে দার্শনিক যুক্তি ও অনুমান, এই দুইয়ের আক্রমণে তা পর্যুদস্ত" (ক্রসরোডস, নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো)।

যে কথা দিয়ে প্রথম দিকে আমি শুরু করেছিলাম— আজকের পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ সংকটগ্রস্ত। যে পুঁজিবাদ একসময় সেক্যুলার হিউম্যানিজমের ঝান্ডা তুলে ধরেছিল, গণতন্ত্র-মানবতাবাদের ঝান্ডা তুলে ধরেছিল, বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, সেই পুঁজিবাদ আজ আমেরিকা থেকে ইউরোপ সব দেশেই ধর্মবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষের আগুন জ্বালাচ্ছে। ভারতবর্ষেও ধর্মীয় বিদ্বেষ, জাতপাত বিদ্বেষের আগুন জ্বালানো হচ্ছে। লক্ষ্য হচ্ছে, সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে রক্ষা করা। মানুষকে বিভ্রান্ত করা, বিপথগামী করা।

অন্য দিকে এই পুঁজিবাদ আরও একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। যে কথা আমি আগে বলেছি, যুক্তিবাদী মনকে এবং মনুষ্যত্বকে হত্যার এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করছে। বিবেককে হত্যা করছে। মানুষকে অমানুষ করছে। মদ খাও, জুয়া-সাট্টা খেলো। ভারতবর্ষে এখন একদিকে গো-হত্যা বন্ধ করার স্লোগান তুলছে, অন্য দিকে মদের দোকান বাড়ানো হচ্ছে, ড্রাগ অ্যাডিকশন সহ নানা নেশায় মানুষকে আচ্ছন্ন করার ষড়যন্ত্র চলছে। এ দুটোই পাশাপাশি চলছে। যত মদের দোকান বাড়াচ্ছে তত নারীধর্ষণ, গণধর্ষণ বাড়ছে। কেউ তো ধর্ষক হিসাবে জন্ম নেয় না! যে শিশু মায়ের কোলে জন্ম নেয়, সে তো মানুষের দেহ নিয়েই জন্ম নেয়। তাহলে এ চরিত্র কোথা থেকে পাচ্ছে? তা পাচ্ছে এই সমাজ থেকে। এই নারীধর্ষণ, গণধর্ষণ, গণহত্যা, ব্যাভিচার রামমোহন বিদ্যাসাগর দেখে যাননি, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুব্রহ্মনিয়ম ভারতী, প্রেমচন্দ, নজরুল দেখে যাননি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, তিলক, লাজপত, নেতাজি দেখে যাননি, ক্ষুদিরাম, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিংরা দেখে যাননি। এ ঘটনা আজ প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি। পশুরাও ধর্ষণ, গণধর্ষণ করে না। এরা পশুরও অধম, মনুষ্যত্বহীন মানুষের দেহ— এ যেন একটা নতুন প্রজাতি। ইউরোপে,

আমেরিকায়, ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ এদের জন্ম দিয়েছে। নানা নেশায় ডুবে থাকো, যৌনতার দাসত্ব করো। নোংরা কুৎসিত যৌনতা ফিল্মের মাধ্যমে, টিভির মাধ্যমে, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মানুষের নৈতিকতাকে খতম করে দিচ্ছে। মনুষ্যত্বকে মেরে দিচ্ছে। কারণ মনুষ্যত্ব থাকলে, বিবেক থাকলে, যুক্তি থাকলে, প্রশ্ন করবে, তর্ক করবে, প্রতিবাদ করবে। এও আরেকটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ। সেজন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, জাতীয় ক্ষেত্রে আজ ভয়াবহ পরিস্থিতির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

সমাজতন্ত্রই একমাত্র বাঁচার পথ

এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের হাত থেকে বাঁচতে হলে চাই মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে শোষিত মানুষের ব্যাপক ঐক্য। চাই কৃষক-শ্রমিকের আন্দোলন, মধ্যবিত্তের আন্দোলন। এই আন্দোলনে সমস্ত স্তরের অত্যাচারিত মানুষকে সামিল করতে হবে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়ে। এ কথা ঠিক, সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে। সমাজতন্ত্র এসেছিল বিরাট আশা-ভরসা নিয়ে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল।

হতাশার কোনও কারণ নেই, আবারও দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে

মনে রাখবেন, মহান লেনিনের সুযোগ্য ছাত্র মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র অসাধারণ অগ্রগতি ঘটিয়ে মানব ইতিহাসে প্রথম শোষণমুক্ত যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, তা প্রত্যক্ষ করে মার্কসবাদী না হয়েও বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের বরেণ্য মানবতাবাদী রমা রলাঁ, বার্নাড শ, আইনস্টাইন এবং আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, প্রেমচাঁদ, সুব্রহ্মনিয়ম ভারতী এবং বহু প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ পশ্চিমী পুঁজিবাদী সভ্যতার শোচনীয় পরিণতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে একমাত্র আশার আলো গণ্য করে গভীর শ্রদ্ধায় অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এঁরা কেউই কমিউনিস্ট ছিলেন না। মনীষী রমাঁ রলাঁ বলেছিলেন, "আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ্য ও কর্মে বিশ্বাসী। যতদিন বেঁচে থাকব, তার পক্ষে কাজ করে যাব" (শিল্পীর নবজন্ম)। বিশ্বখ্যাত বার্নাড শ বলেছিলেন, "পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র একটি দেশেই আছে, সেটি হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যেখানে মহান স্ট্যালিন বেঁচে আছেন" (নিউ স্টেটসম্যান অ্যান্ড নেশন, ১৯৩৪)। এবার শুনুন, অন্য

কয়েকজন বড় মানুষের কথা। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সৃষ্ট নতুন সভ্যতার অগ্রগতি দেখে কী বিপুল ভরসা করে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে মুগ্ধ চিত্তে লিখেছেন, "...মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড এক বিপ্লবের ওপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব — এ বিপ্লব অনেক দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান। ...নব্য রাশিয়া মানবসভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড় মৃত্যুশেল তোলবার সাধনা করছে, যেটাকে বলে লোভ। প্রার্থনা আপনি জাগে যে, তাদের এই সাধনা সফল হোক" (চিঠিপত্র, ১১শ খণ্ড, বিশ্বভারতী)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ফ্যাসিস্ট শক্তির আক্রমণে সমগ্র মানব সভ্যতা বিপন্ন, তখন মৃত্যুশয্যায় রবীন্দ্রনাথ ত্রাতা হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকেই গণ্য করেছিলেন। সেই সময় তাঁর দেখাশুনা করছিলেন বৈজ্ঞানিক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তিনি লিখছেন, "জার্মানি যখন রাশিয়া আক্রমণ করল, শেষ অসুখের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বারে বারে খোঁজ নিয়েছেন রাশিয়ায় কী হচ্ছে। বারে বারে বলেছেন, 'সবচেয়ে খুশি হই রাশিয়া যদি জেতে।' সকালবেলা অপেক্ষা করে থাকতেন যুদ্ধের খবরের জন্য। যেদিন রাশিয়ার খবর একটু খারাপ, খুব ম্লান হয়ে যেতেন, খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। যেদিন অপারেশন করা হয়, সেদিন সকালবেলায় অপারেশনের আধ ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর শেষ কথা — 'রাশিয়ার খবর বলো', বললুম, 'একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে।' কবির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন, 'হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে, ওরাই পারবে" (তথ্যসূত্র ঃ কবিকথা— প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, বিশ্ববাণী পত্রিকা, ১৩৫০)। স্ট্যালিন নেতৃত্বাধীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কতটা আস্থা রবীন্দ্রনাথের ছিল! দুঃখের বিষয়, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধজয় দেখে যেতে পারেননি। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই শরৎচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে ছোট্ট কথায় গান্ধীজির মূল্যায়ন করে বলেছিলেন, "তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে। এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।" নিষ্ঠুর অত্যাচারে জর্জরিত শ্রমিকদের দুর্দশা দেখে তিনি শ্রমিকদের পুঁজিবাদী সভ্যতার ধ্বংসের আহ্বান জানিয়ে শ্রমিক শ্রেণিকে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে বলেছিলেন, " আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা— তোরা মর। কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমনধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে

তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা" (শ্রীকান্ত— শরৎচন্দ্র)। সেই যুগের বিপ্লবীদের শ্রমিক বিপ্লবের অপরিহার্যতা বোঝাবার জন্য শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী' উপন্যাসে শ্রমিকদের বলেছিলেন, " ... এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই। এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই— হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, জৈন, শিখ কোন কিছুই নেই, — আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক। তোমাদের গায়ের জোরকে তারা ভয় করে, তোমাদের শিক্ষার শক্তিকে তারা অত্যন্ত সংশয়ের চোখে দেখে, তোমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় তাদের রক্ত শুকিয়ে যায়। ... তাই, মাত্র তোমাদের জীবনধারণটুকুর বেশি তিলার্ধ যে তারা স্বেচ্ছায় কোন দিন দেবে না — এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা কি তোমাদের এতই কঠিন?... জনকতক কুলি-মজুরের ভাল করার জন্য পথের দাবী আমি সৃষ্টি করিনি। এর ঢের বড় লক্ষ্য। এমন করে এদের ভাল করা যায় না — এদের ভাল করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্য দিয়ে" (পথের দাবী— শরৎচন্দ্র)। আতঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত কমিশন 'পথের দাবী' নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেছিল, "Towards the end of the book the hero works himself upon a state of frenzy, throws away all restraints and preaches pure Bolshevism"। এই শরৎচন্দ্র 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' নিবন্ধে বলেছেন, "এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মতো যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে" (সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক মানবতাবাদী তামিল সাহিত্যিক সুব্রহ্মানিয়ম ভারতী সোভিয়েত বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে লিখেছিলেন, "It appears as if the Socialist Party (communist party) in Russia would achieve its objectives. ... The main principle of this party is to change the present property ownership by which a few are wealthy and many are poor. ..."। আরেকজন দেশপ্রেমিক মানবতাবাদী হিন্দি সাহিত্যিক প্রেমচন্দও সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রশংসা করে লিখেছেন, "সোভিয়েত রাশিয়ায় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার ফল আশাতীত হচ্ছে।... যেখানে মানুষের শাসনব্যবস্থা মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয় সেখানে এই সাফল্যই অর্জিত হয়। ... রাশিয়া একাগ্র চিত্তে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। সেখানে বেকারিত্ব নেই, বাণিজ্যে মন্দাও নেই" (সোভিয়েত রাশিয়ায় উন্নতি)। আর সেই যুগের বাংলার সংগ্রামী কবি নজরুল ইসলাম কাব্যিক ভাষায় রাশিয়ার বিপ্লবের প্রশংসা করে লিখেছেন, "দূর সিন্ধুতীরে

বসে ঋষি কার্ল মার্কস যে মারণ-তন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলো। জার গেল — জারের রাজ্য গেল —ধনতান্ত্রিক প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। কার্ল মার্কসের ইকনমিকসের অঙ্ক এই যাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অঙ্ক লক্ষ্মী হয়ে উঠেছে। পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে। ভোরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মত এর করুণ মাধুরী বিশ্বকে পরিব্যপ্ত করে ফেলেছে" (বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য— কাজী নজরুল ইসলাম)। কবি নজরুল ইন্টারন্যাশনাল সংগীতের অনুসরণে একটি সংগীতও রচনা করেছিলেন।

আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না যে শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেকে মার্কসবাদী হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩০ সালে ২১ জানুয়ারি লেনিনের মৃত্যুদিবসে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাথীদের নিয়ে স্লোগান তুললেন, 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ', 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল জিন্দাবাদ', 'মহান লেনিন অমর রহে'। তার পর তিনি একটি লিখিত বিবৃতি পড়লেন, তাতে আছে, "আজ, লেনিন দিবসে, আমরা তাঁদের সকলকেই আমাদের হৃদয়ের অভিনন্দন পাঠাই যাঁরা মহান বিপ্লবী লেনিনের নীতি ও আদর্শ সামনে রেখে, কিছু না কিছু কাজ করে চলেছেন। রাশিয়ার বুকে এগিয়ে চলা সামাজিক, অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলিরও সঙ্গে আমরা একাত্মতা প্রকাশ করি। সর্বহারার জয় অবধারিত। পুঁজিবাদের ধ্বংস অনিবার্য। সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুও আসন্ন" (Telegram on Lenin's death anniversary– Selected Writings of Shaheed Bhagat Singh, edited by Shiv Verma)। ফাঁসির আগে এক চিঠিতে সহযোদ্ধা ও শহিদ শুকদেবকে ভরসা দিয়ে লেখেন, "You and I may not live but our people will survive. The cause of Marxism and communism is sure to win."(ওই)

নেতাজি সুভাষচন্দ্রও মার্কসবাদ ও সোভিয়েত বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেছিলেন, "ঊনবিংশ শতকে জার্মানি তাহার মার্কসীয় দর্শনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে বিশ্ব সভ্যতাকে দান করিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া সর্বহারা বিপ্লব, সর্বহারা সরকার ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের মধ্য দিয়া পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে" (ক্রসরোডস্, নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো)। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি গভীর ভরসা ব্যক্ত করে বলেছিলেন "Against this background of unrest stands Soviet Russia, whose very existence strikes terror into the heart of the ruling classses in every imperialist state."(ওই)। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে

সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স যখন ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও ইটালির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছিল, তখন গভীর উদ্বেগে ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে নেতাজি বলেছিলেন, "The so-called democratic powers, France and Great Britain have joined Italy and Germany in conspiring to eliminate Soviet Russia from European politics, for the time being. But how long will that be possible?" (ওই)। আই এন এ বাহিনী পরাস্ত হওয়ার পর ১৯৪৫ সালের ২৫ মে সিঙ্গাপুর বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি আশার বাণী শুনিয়ে বলেছিলেন, "আজ যদি ইউরোপে এমন কোনও একজন মাত্র ব্যক্তি থাকেন যাঁর হাতে আগামী কয়েক দশকের জন্য ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাগ্য ন্যস্ত, তবে তিনি হলেন মার্শাল স্ট্যালিন। সুতরাং ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়ন কী করে না করে তাহার দিকে সর্বাধিক উদ্বেগ নিয়ে গোটা বিশ্ব এবং সর্বোপরি গোটা ইউরোপ তাকিয়ে থাকবে... যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপে একটি শক্তিই আছে যার নিজস্ব পরিকল্পনা আছে এবং যে পরিকল্পনা প্রয়োগ করার যোগ্য, সেই শক্তি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে পরিকল্পনা সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে, তাকে গ্রহণ করা ব্যতীত ইউরোপীয় দেশগুলির বিকল্প অন্য কোনও পথ নেই" (১৯৪৫ সালের ২৫শে মে সিঙ্গাপুর বেতার কেন্দ্র থেকে বিবৃতি)। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কতটা আস্থা থাকলে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েও নেতাজি এই আশার বাণী শোনাতে পারেন। অথচ এটা বোঝার মতো মানসিকতা আজ এদেশে ক'জনের আছে! আজকাল বুদ্ধিভ্রষ্ট, টাকায় বিক্রি হওয়া যে-সব বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র ও মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে অপ্রপ্রচার চালাচ্ছে, তারা কি যথার্থ বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিক? নাকি উপরে যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম তাঁরাই যথার্থ বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিক? আপনারা বিচার করে দেখুন।

হ্যাঁ সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে। ধ্বংস করেছে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ, আর রাশিয়ার অভ্যন্তরের পরাস্ত পুঁজিবাদ। যতদিন লেনিন ছিলেন, স্ট্যালিন ছিলেন, অতন্দ্র প্রহরীর মতো সমাজতন্ত্রকে তাঁরা রক্ষা করেছেন। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর যারা নেতৃত্বে এল, তারা অধঃপতিত হল, মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হল, তাদের মধ্যে সংশোধনবাদী বিচ্যুতি দেখা গেল, তারা পুঁজিবাদের ভাবধারা এবং সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হল। সাম্রাজ্যবাদ বাইরে থেকে দীর্ঘদিন ধরে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছিল। আবার ভেতরের প্রতিবিপ্লবী পুঁজিপতিরাও ষড়যন্ত্র করছিল। সেই চক্রান্তের সাথে এই সংশোধনবাদীরাও যুক্ত হয়ে গেল।

রাশিয়ায় ও পরে চীনে সমাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেল। এতে দুঃখ হতে পারে, কিন্তু হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। আগেও আমরা বলেছি, কোনও নতুন আদর্শ ও সমাজব্যবস্থার চূড়ান্ত জয়লাভ করতে দীর্ঘ সময় লাগে। যে ধর্মীয় আন্দোলন, যাঁরা বলতেন, ঈশ্বর তাঁদের শক্তির উৎস— খ্রিস্ট ধর্মীয় আন্দোলন, ইসলাম ধর্মীয় আন্দোলন, কি হিন্দু ধর্মীয় আন্দোলন বলুন— তাঁদেরও চূড়ান্ত জয়লাভ করতে শত শত বছর লড়াই করতে হয়েছে। পরাজয়-জয়-পরাজয়-জয়। নবজাগরণ থেকে বুর্জোয়া পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক বিপ্লব—এই সমগ্র পর্বকে ধরলে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় সাড়ে তিনশো বছর লড়াই হয়েছে ইউরোপে। তার মাঝখানে কখনও প্রজাতন্ত্র জিতেছে, কখনও রাজতন্ত্র জিতেছে। ধর্মীয় আন্দোলন, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি আন্দোলন শোষণ উচ্ছেদের কথা বলেনি। বলার কথাও নয়। কিন্তু সমাজতন্ত্র উচ্ছেদ করতে গেছে দাসপ্রথা-সামন্ততন্ত্র-পুঁজিবাদ — পরপর কয়েক হাজার বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত শোষণ ব্যবস্থাকে। তা হলে আশি বছরে সমাজতন্ত্রকে কয়েক হাজার বছরের শোষণের ইতিহাসকে পরিবর্তন করার জন্য লড়াই করতে হয়েছে। সহজ কথা নয়! যে ক'বছরই টিকে থাকুক, এই সমাজতন্ত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন পুঁজিবাদী দুনিয়ায় নতুন সভ্যতার আলো নিয়ে এসেছিল। পশ্চিম দিগন্তে যখন বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন পূর্ব দিগন্তে নতুন সূর্যোদয় হিসাবে সর্বহারা গণতন্ত্র এসেছিল। সমাজতন্ত্র ইতিহাসের প্রয়োজনে এসেছে, শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির প্রয়োজনে এসেছে। আবারও আসবে। ইতিহাসের এই নিয়ম রোখবার ক্ষমতা কারওরই নেই। ফলে আবারও লড়াই হবে। আমেরিকার শ্রমিক আবার ধর্মঘট করছে, ফ্রান্সে, জার্মানিতে ধর্মঘটের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বারবার বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। রাশিয়াতে শৃঙ্খলিত শ্রমিক শ্রেণি আবার মাথা তুলছে। তারা লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি নিয়ে মিছিল করছে। চীনে নতুন করে মাও সে-তুঙের বিপ্লববাদের চর্চা হচ্ছে। এর মধ্যেই রয়েছে ভবিষ্যৎ। যেমন প্যারি কমিউনের পরাজয় থেকে শিক্ষা নিয়ে মার্কস বলেছিলেন, শ্রমিক শ্রেণি বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে নতুন শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সফল অভ্যুত্থানের পরও ক্ষমতা রক্ষা করা যায় না, যে শিক্ষা রুশ বিপ্লবে লেনিন কাজে লাগিয়েছিলেন। যেমন রুশ বিপ্লব থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিয়েই মাও সে-তুঙ চীনে বিপ্লব করেছিলেন। তেমনি রাশিয়া ও চীনে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ও অনেক শিক্ষা দিয়ে গেছে, যার ভিত্তিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী হলেও, রাষ্ট্র শক্তিশালী হলেও সুপার-স্ট্রাকচার বা উপর কাঠামোতে আলাদাভাবে

আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক শ্রেণিসংগ্রাম চালিয়ে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতির প্রভাব যদি পুরোপুরি নির্মূল না করা যায়, ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত করে উন্নত সর্বহারা বিপ্লবী চেতনায় শিক্ষিত না করা যায়, তা হলে বিপ্লব অনেক সাফল্য সত্ত্বেও বারবার মার খাবে। আগামী দিনে যে কোনও দেশে বিপ্লব হোক, তারা এই শিক্ষায় শক্তিশালী হবে। একবার ভেবে দেখুন, সমাজতন্ত্রের জন্য আন্দোলন যদি না হয়, আমরা যদি হতাশায় নিমজ্জিত হই এবং তার ফলে যা চলছে তা-ই যদি চলে, তা হলে অনাহারে মৃত্যু, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু, বেকারি, ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি এবং নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা এগুলি আরও বাড়তেই থাকবে। আমরা কি তা চলতে দেব?

শ্রমিক শ্রেণির এই নতুন সভ্যতা এসেছিল, যেখানে ছাঁটাই ছিল না, বেকারি ছিল না। সকলের চাকরির গ্যারান্টি ছিল। সকলের শিক্ষার সুযোগ ছিল, চিকিৎসার সুযোগ ছিল। নারীর সমানাধিকার ছিল। বৃদ্ধদের, শিশুদের নিরাপদ আশ্রয় ছিল। সমাজতন্ত্র দ্রুতগতিতে এগোচ্ছিল। কিন্তু সেই সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করল বাইরের সাম্রাজ্যবাদী আর সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে পরাস্ত পুঁজিবাদ গোপনে ষড়যন্ত্র করে। সেই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মার্কস থেকে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং, শিবদাস ঘোষ সকলেই সতর্ক করেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ এটাও দেখিয়েছিলেন, বিপ্লব পূর্ববর্তী রাশিয়ার পুঁজিবাদ অনুন্নত ছিল এবং কৃষিতে ও সংস্কৃতিতে সামন্ততন্ত্রের প্রাধান্য ছিল, আর চীনে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। ফলে উভয় দেশে বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তি স্বার্থ গৌণ এই মূল্যবোধ কমিউনিস্টদের মধ্যে কাজ করলেও এটা মূলত ছিল বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ। বিপ্লবের পর অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে এটা সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ হিসাবে বিপদ সৃষ্টি করে সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদ বিরোধী পুনরায় ব্যক্তিগত ভোগের আকাঙ্ক্ষা, সম্পত্তিবোধের মানসিকতা নিয়ে আসে। তিনি দেখিয়েছিলেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কাঠামোতে শ্রেণিসংগ্রাম চালাবার সাথে সাথে সুপার স্ট্রাকচার বা উপর কাঠামোতেও শ্রেণিসংগ্রাম চালাতে হয়। যেটা রাশিয়া ও চীনে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়নি। ফলে সমাজতন্ত্রের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত প্রতিবিপ্লব সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করল। সোভিয়েতের নাগরিক, চীনের নাগরিক— এদের মধ্যে আত্মম্ভরিতা এসেছিল বিরাট বৈষয়িক অগ্রগতি থেকে। তারা সজাগ থাকেনি, রাজনৈতিক চেতনা ও সংস্কৃতির মান আরও উন্নত করার জন্য সংগ্রাম করেনি, বরং পূর্বের অর্জিত মান নেমে গিয়েছিল। নতুন জেনারেশন এসেছে, যারা আগেকার দুঃখ-অত্যাচার-শোষণ দেখেনি, বরং

প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও সংস্কৃতির মান নিচু হওয়ায় পার্টি ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিবর্তে যান্ত্রিক সম্পর্কের প্রাধান্য সৃষ্টি হয়েছিল, যা স্তরে স্তরে ব্যুরোক্রেসি ও আলট্রা-ডেমোক্রেসির জন্ম দিয়েছিল। মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের পার্থক্য দূর হয়নি। তার ফলে মানসিক শ্রমের অধিকারীদের মধ্যে সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছিল। এ ছাড়াও ব্যাপক জনগণ সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করলেও তারা মার্কসবাদী ছিলেন না, ফলে তাদের মধ্যে অমার্কসবাদী চিন্তা বা বুর্জোয়া চিন্তার প্রাধান্য ছিল। ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটলেও ব্যক্তি মালিকানাভিত্তিক যে চিন্তা, রাশিয়া ও চীনের জনগণের মধ্যে তা লুপ্ত হয়নি, এটা ছিল। এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজন ছিল। মহান স্ট্যালিন মৃত্যুর আগে এই লড়াইয়ের ডাক দিয়েছিলেন। শেষ জীবনে এই বিপদ তিনি বুঝেছিলেন। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে প্রতিবিপ্লব সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করল সংশোধনবাদের পথ বেয়ে। একই ভাবে চীনেও প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হল, যদিও এর বিরুদ্ধে মহান মাও সে-তুঙ মৃত্যুর আগে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন। একথা মনে রাখবেন, মনীষী রমাঁ রলাঁ বলেছিলেন "... আজ পৃথিবীতে সোভিয়েত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমাবেশ গড়িয়া উঠিতেছে। ... যদি ইহা ধ্বংস হইয়া যায় তবে শুধু রাশিয়ার সর্বহারারাই ক্রীতদাসে পরিণত হইবে না, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সর্বপ্রকার স্বাধীনতারই সমাধি হইবে। বিশ্বকে বহু যুগ পিছনে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে" (শিল্পীর নবজন্ম — রমাঁ রলাঁ)। আজকের বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন, এই মনীষীর সতর্কবাণী কত সঠিক।

সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রতিরোধে ও বিশ্বশান্তি রক্ষায় সমাজতন্ত্র অতন্দ্র প্রহরী ছিল

সমাজতন্ত্র যতদিন শক্তিশালী ছিল, বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। আজ সমাজতন্ত্র নেই। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের একচেটিয়া লুণ্ঠনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে গোটা বিশ্বের শোষিত মানুষ। অন্য দিকে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশ মারণাস্ত্র বাড়িয়ে চলেছে, যুদ্ধাস্ত্র বাড়িয়ে চলেছে। এই সমস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলো ঋণগ্রস্ত। শিক্ষার বাজেট কমাচ্ছে, স্বাস্থ্যের বাজেট কমাচ্ছে, কৃষির বাজেট কমাচ্ছে, পাবলিকের কিছুটা উপকার হয়, এসব ক্ষেত্রেই বাজেট ছাঁটাই করছে। কিন্তু সামরিক খাতে বাজেট বাড়াচ্ছে। যুদ্ধ চাই, যুদ্ধাস্ত্র চাই, যুদ্ধ বাহিনী চাই। এবং যুদ্ধ চলছেও। এই যে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইরাক

আক্রমণ করল সাদ্দাম হোসেন মারণাস্ত্র তৈরি করেছে এই মিথ্যা অজুহাত তুলে— যার কোনও প্রমাণ তারা আজ পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। এখন বলছে, আমরা ভুল করেছি। অথচ একটা দেশকে প্রায় ছাই করে দিল। ১৯৫৪ সালে সুয়েজ ক্যানেল জাতীয়করণ করার সময় মিশর আক্রমণ করেছিল ফরাসি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। রাশিয়া বারো ঘণ্টার নোটিশ দিয়েছিল— সৈন্য সরাও, না হলে লন্ডনে প্যারিসে আমরা বোমা ফেলব। ব্রিটিশ এবং ফরাসি নাগরিকদের বলল, তোমাদের সাথে কোনও শত্রুতা নেই, তোমাদের সরকার মিশর আক্রমণ করেছে, তোমরা বন্ধ কর। বারো ঘণ্টার বদলে ছ'ঘণ্টার মধ্যেই মার্কিন মদতপুষ্ট ব্রিটিশ এবং ফরাসি বাহিনী ভয়ে সরে গেল। আজ ইরাককে ধ্বংস করল, লিবিয়া, আফগানিস্তানকে ধ্বংস করল। সিরিয়াকে আক্রমণ করেছে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র থাকলে এটা পারত? বিন লাদেনকে কে সৃষ্টি করেছে? আল কায়দা, আই এস-কে কারা তৈরি করেছে? সাম্রাজ্যবাদীরা। এ যুদ্ধ তাদের দরকার। এদের হাতে অস্ত্র কে জোগাচ্ছে? এদের কি দেশ আছে, রাষ্ট্র আছে? এই যে আই এস গোষ্ঠী আক্রমণ চালাচ্ছে, এত অস্ত্র তারা পাচ্ছে কোথা থেকে? তাদের কি অস্ত্রের কারখানা আছে? সাম্রাজ্যবাদীরাই এই অস্ত্র জোগাচ্ছে। সিরিয়াতে 'প্রক্সি ওয়ার' চলছে। এক দিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, আর এক দিকে সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উন্নীত রাশিয়ার পুঁজিবাদ। একদিকে সিরিয়ার সরকারের পক্ষে রাশিয়া, আর সিরিয়া সরকারকে উচ্ছেদ করতে চাইছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। আর একটা যুদ্ধের বিপদ দেখুন। উত্তর কোরিয়াকে ধ্বংস করার জন্য মার্কিন রণতরী যাচ্ছে। আর ও দিকে চীনেও পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উপনীত। চীনের রাষ্ট্রপতি সৈন্যবাহিনীকে বলছে, যে কোনও সময় যুদ্ধ বাধতে পারে, আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। ফলে আর একটা যুদ্ধের বিপদ আসছে। এ যুদ্ধ আঞ্চলিক যুদ্ধ হতে পারে, ব্যাপকতর যুদ্ধও হতে পারে। যুদ্ধের প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের। যুদ্ধ তার চাই— যে অস্ত্র তৈরি করেছে, সে অস্ত্র খালাস করতে হবে। অস্ত্র ব্যবসার জন্য চাই যুদ্ধ। আবার, অন্য দেশের উপরও আধিপত্য বিস্তার করতে হবে, তার জন্যও যুদ্ধ চাই। ফলে এ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আজ সোভিয়েত ও চীনে সমাজতন্ত্র থাকলে কি এই পরিস্থিতি হোত?

এই অবস্থার মধ্যেই আমরা মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে ভারতবর্ষে শ্রমিক-চাষি-গরিব মেহনতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম গড়ে তুলছি। ভারতীয় পুঁজিবাদ, যে পুঁজিবাদ ফ্যাসিবাদের জন্ম দিচ্ছে, যে পুঁজিবাদ নিজে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উপনীত, যে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে আজ হাত মেলাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে

আমরা লড়ছি। আপনারা হয়ত লক্ষ করছেন না, ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ আজ আমেরিকা-ইজরায়েল--জাপান-অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে— শুধু অর্থনৈতিক চুক্তি নয়, সামরিক জোট করছে সাম্রাজ্যবাদী চীন এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে। ফলে আগামী দিনে ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি আমরা। এই অবস্থায় জনগণকে সংঘবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংগঠিত হতে হবে।

আমি আগেও বলেছি, বামপন্থীদের ঐক্য আমরা চাই। ঐক্য ভেঙেছিল সিপিএম। আবার তারা ঐক্যের জন্য এসেছিল আমাদের কাছে। আমরা সাড়া দিয়েছিলাম। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই দু'টি ইস্যু নিয়ে কিছু প্রোগ্রাম শুরুও হয়েছিল। হঠাৎ, আমাদের সাথে একটা কথাও না বলে সিপিএম ঐক্য ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসের সাথে চলে গেল ভোটের স্বার্থে। সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা ভেবে দেখুন, তাদের দল কতটা ভোটসর্বস্ব হলে এটা পারে! কংগ্রেস কি গণতান্ত্রিক শক্তি? জরুরি অবস্থা কে জারি করেছিল? মিসা, টাডা, আফস্পা কে জারি করেছিল? দাঙ্গা কি শুধু বিজেপি বাধিয়েছিল? কংগ্রেস রাজত্বে দাঙ্গা বাধেনি? বিহারের ভাগলপুরে, ওড়িশার রাউরকেল্লায়, আসামের নেলিতে কংগ্রেস শাসনেই তো বীভৎস দাঙ্গা হয়েছিল। দিল্লিতে শিখ নিধনযজ্ঞ কাদের নেতৃত্বে হয়েছিল? সেই কংগ্রেসের সাথে তারা ঐক্য করছে গণতন্ত্র রক্ষার নামে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে! আসলে ওদের চাই ভোটের ঐক্য। এ তো চরম সুবিধাবাদ। বামপন্থী ঐক্য যেটা গড়ে উঠছিল তাকে তারা ছুরিকাঘাত করল। আমরা এখনও প্রস্তুত। আমরা বলছি আপনারা কংগ্রেসের হাত ছেড়ে গণআন্দোলনের পথে আসুন। ভোটের ঐক্য নয়, আন্দোলনের ঐক্য চাই। মিলিট্যান্ট লেফট মুভমেন্ট চাই আমরা এবং গোটা ভারতবর্ষব্যাপী এই মুভমেন্ট চাই।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে বলতে চাই, অবিভক্ত বাংলার গৌরবোজ্জল সংগ্রামী ঐতিহ্যকে স্মরণ করুন। যদিও বাংলার এই অগ্রগতি ঘটেছিল ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে। ওই সময় কলকাতা ছিল রাজধানী। এখানেই প্রথম ইংরেজি শিক্ষা চালু হয়েছিল, পাশ্চাত্যের উন্নত চিন্তাধারা, দর্শন, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান এখানে প্রথম পৌঁছেছিল। ভারতবর্ষের যে কোনও রাজ্যেই প্রথম ইংরেজি শিক্ষা চালু হলে এটা ঘটতে পারত। ফলে এজন্য বাঙালি হিসাবে আলাদা অহংকার করার কিছু নেই। একদিন ভারতবর্ষ বলত, হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো। সেদিন এই অবিভক্ত বাংলা ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল,

সি আর দাশ, সুভাষচন্দ্রের জন্ম, ক্ষুদিরামের জন্ম, বহু বিপ্লবীর জন্ম এই বাংলায়। এই বাংলাতেই বিজ্ঞানী প্রফুলচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহার জন্ম। সাহিত্যে, দর্শনে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমস্ত দিক থেকে এই বাংলা কত উচ্চাসনে ছিল। সেই বাংলা কি আজ বিজেপি-আরএসএসের ঝান্ডা বহন করবে? ফ্যাসিবাদের ঝান্ডা তুলে ধরবে? না এর বিরুদ্ধে সেই সংগ্রামী ঐতিহ্য বহন করে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ঝান্ডা তুলে ধরবে? সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ঝান্ডা তুলে ধরবে? এটাই আপনাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন।

আপনারা গ্রামে গ্রামে এলাকায় এলাকায়, শ্রমিক বস্তিতে, কৃষক-খেতমজুরদের এলাকায় গণকমিটি গড়ে তুলুন, ছাত্র-যুব কমিটি গড়ে তুলুন। গণসংগঠন গড়ে তুলুন। নানা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন। যেখানেই অন্যায়-অত্যাচার দেখবেন সেখানেই সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করুন। আর মনীষীদের জন্মদিবস-মৃত্যুদিবস উদযাপন করুন। এরা চায় যুবসমাজ মদে ডুবে থাকুক। মদ খাক, নোংরা নারীদেহ নিয়ে কুৎসিত আলোচনায় মত্ত থাকুক। আর হিন্দুত্বের জয়গান গাও, গোহত্যা বন্ধের স্লোগান তোল। এরা চায় মানুষ রামমোহনকে ভুলে যাক, বিদ্যাসাগরকে ভুলে যাক, রবীন্দ্রনাথ, সুব্রহ্মনিয়ম ভারতী, প্রেমচন্দ, শরৎচন্দ্র, নজরুলকে ভুলে যাক। সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিংদের ভুলে যাক। এই ঐতিহ্য যেন নষ্ট হয়ে যায়। এঁদের জন্মদিন-মৃত্যুদিন আপনারা উদযাপন করুন, আমরা চাই। এঁদের স্মৃতি বহন করুন, এঁদের চরিত্র থেকে শিক্ষা নিন। কমরেড ঘোষ বলেছেন, সর্বহারা বিপ্লবী হতে হলে এঁদের চরিত্র থেকে গ্রহণ করে আর এক ধাপ এগোতে হবে। তিনি বলেছেন, আগে মানবতাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ আয়ত্ত করুন, স্বদেশি আন্দোলনের উন্নত সংস্কৃতির স্তর আয়ত্ত করুন। তিনি বলেছেন, "...আমরা ছিন্নমূল হয়ে পড়েছি। সংস্কৃতির যে উচ্চ আধারটা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তৈরি হয়েছিল, আমরা তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছি না। বড় কথাগুলো আমরা বিশ্বের থেকে আহরণ করেছি, কিন্তু দেশের মাটিতে গড়ে ওঠা উচ্চ সংস্কৃতির সুরের সঙ্গে আমরা যেন যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। সেই যোগসূত্রটি গড়ে তুলতে হবে" (শরৎ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে, শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি, ৩য় খন্ড)। ফলে আমাদের ক্ষুদিরাম থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং থেকে শিক্ষা নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। সকল বড় মানুষ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। এঁদের গুণাবলি আয়ত্ত করে তারপর আর একধাপ এগিয়ে সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করতে হবে। ফলে এই আন্দোলন সংগঠিত করুন। আর সকলকে বলব, আপনারা শিশুদের নিয়ে রবিবার সকালবেলা পাড়ায় পাড়ায়

খেলাধূলা করুন। শিশুরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নোংরা আলোচনা করছে। এমনকী ক্লাস ফোর ফাইভের কিছু কিছু ছেলেমেয়ে কুৎসিত যৌনতায় যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এ কত ভয়ঙ্কর বিপদ, ভেবে দেখুন। এই বাচ্চাদের মধ্যে আপনারা বড় মানুষদের নিয়ে, বিপ্লবী ও শহিদদের নিয়ে চর্চা করুন। বিতর্ক সভা করুন, সঙ্গীত, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিষয় নিয়ে চর্চা করুন, খেলাধূলার আয়োজন করুন। পাড়ায় পাড়ায় একটা নতুন আন্দোলন গড়ে তুলুন। এই হল আমাদের দলের আহ্বান।

ফলে এক দিকে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন, শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলুন, গণকমিটি গড়ে তুলুন, ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলুন। অন্য দিকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলুন। পুনরায় আবেদন করব, শিশুদের রক্ষা করুন। এদের সত্যিকারের মানুষ হিসাবে গড়ে তুলুন। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বের অত্যাচারিত মানুষ, সমগ্র মানব সভ্যতা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে, আকুলভাবে মুক্তি চাইছে। এই মুক্তি অর্জন একমাত্র সম্ভব মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করার দ্বারা। অবশ্যই রাশিয়া ও চীনের থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এই বিপ্লব সফল ও রক্ষা করতে হবে। এই আহ্বান জানিয়ে আমি এইখানে শেষ করছি।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) জিন্দাবাদ
মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ